প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক
অমিত সরকার
সাম্প্রতিক
৫২/২, সিকদারবাগান স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০৪
মুদ্রক
পূর্বোদয় প্রেস
১০, কৈলাস বসু স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সাত টাকা

কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

মূল উর্দু গ্রন্থটির নাম ছিল 'যব ক্ষেৎ জাগে'। সেই অনুযায়ী আমাদের এই অনুবাদ গ্রন্থটিরও একই নামকরণ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু, কার্যত তা সম্ভব হল না, নানা কারণে।

বাংলায় এই অনুবাদ গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই। অনুবাদটিতে কৃষণ চন্দরের লেখা ভূমিকাটি ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রীকমলেশ সেন সেই মূল্যবান ভূমিকাটি অনুবাদ করে দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পৃষ্ঠভূমি

যদিও কৃষক নই, তবুও কৃষকদের মধ্যে থাকার সুযোগ আমার জীবনে ঘটেছে। আমার শৈশব এবং কৈশোর কৃষকদের মধ্যেই অতিবাহিত। কৃষকদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত যে-সব কাজ—হালচালানো, নিরাই করা, ধান বোনা, ফসল কাটা-এসব তাদের কাছ থেকেই জেনেছি। শ্রমরত মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা তা আমাকে ভারতীয় কৃষকরাই শিখিয়েছেন। প্রকৃতির প্রতি যে ভালোবাসা এবং স্বতন্ত্র পরিবেশে থাকা ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার যে বাসনা আমার অধিকাংশ গল্পে আপনারা এযাবৎ দেখেছেন তা আমি এদেশের কৃষকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাদের সঙ্গে থাকার জন্যে, যে অত্যাচার তাদের ওপর চলে আসছে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগও পেয়েছি। আর তা বর্তমান জীবন ব্যবস্থার ওপর পুরোনো জীবন ব্যবস্থার ভার চাপিয়ে দিয়েছে। এক এক সময় মনে হয় আমি নিজেই তাদের ঘরের ওপর এই জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি ছিলাম গ্রামের সামন্তশ্রেণীর সন্তান। তাদের এই অবস্থার জন্য আমার বাবাকেই আজ দায়ী মনে হয়। কারণ উঁচু শ্রেণীর সবাই আমার বাবার বন্ধু কিম্বা বন্ধুর বন্ধু। অন্যদিকে, কৃষক এবং কৃষক সন্তানরাই ছিল আমার বন্ধু। তাদের বাড়ির দরজা আমার জন্য ছিল সর্বদা উন্মুক্ত। কিন্তু আমি থাকতাম আমার উচ্চ বর্গের বাবার কাছে। তাই দু'দিক থেকেই কৃষকদের দেখতে পেয়েছি, বাধ্য হয়েই দেখেছি।

শোষণের এই ধারা শুরু হয় এক দরজা থেকে এবং আর এক দরজায় গিয়ে শেষ হয়। সেই সময় আমি যে-জিনিসটা বুঝতে পারতাম না তা হচ্ছে, নৈতিকতার দু'টি পৃথক পৃথক দিক। যার একটি তৈরি করছে অভিজাত বর্গ এবং অন্যটি কৃষকরা। অভিজাতদের ভালো ভালো কাপড়ের প্রয়োজন, কৃষকদের তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, ভালো কাপড় পড়লে তারা মর্যাদাশীল হয়ে উঠবে। আমাদের ঘড়ের লোক এবং অন্যান্য অভিজাত বর্গ দিনে দু'তিনবার ভরপেট্টা আহার করতে পারে কিন্তু, কৃষকরা দিনে দু'তিনবার আহার করলেই তা হবে অন্যায় কারণ, এতে তাদের স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে এবং সেবা-আত্তি করবে না। কেউ কাজ করলে অবশ্যই তার কাজের বিনিময়ে পয়সা পাওয়া উচিত। কিন্তু, আমরা কৃষকদের বিনা পয়সাতেই খাটিয়ে নিই।

আমাদের অভিজাত বর্গের ঘড়ে মা-বোনের ইজ্জৎ আছে, ঘড়ে তাদের

ভীষণ সম্মান করা হয়, অঞ্চলের তহসিলদার হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও সব সময়েই বোরখা পরতেন। কিন্তু কৃষকদের মা-বোন, স্ত্রীদের বেইজ্জত করা ছিল ন্যায়সম্মত।

কিশোর বয়সে আমি এক রাজাকে দেখেছি। তিনি মাঝে মাঝে তার জমিদারী দেখতে বার হতেন এবং যে-গ্রামে যেতেন সেখানকার সমস্ত কৃষক এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদের আনতেন বেঁধে। পুরুষ এবং মহিলাদের দাঁড় করাতেন পৃথক পৃথক সারিতে। পুরুষদের জুতো দিয়ে পেটাতেন এবং মহিলাদের পাঠিয়ে দিতেন তার কর্মচারীদের তাবুতে, সারারাতের জন্য। এই দৃশ্য আমি নিজের চোখেই দেখেছি। একবার নয় বহুবার।

এইসব নিয়েই আমার কৈশোর। এক কংগ্রেসী বন্ধু বলেছেন, এমন ঘটনা সিমলা যাওয়ার পথে অনেক গ্রামেই দেখা যায়। সেখানে জলের ভীষণ অভাব। জলের জন্য গ্রামের মেয়েদের যেতে হত পাহাড়ের জঙ্গলে, ঝরণায়। এই পাহাড় আর জঙ্গল মহকুমার ইজারাদারদে অধীনে ছিল। তাই, এই ঝর্ণায় জল নেবার বিনিময়ে তাদের দিতে হত নিজেদের সতীত্বকে। খবরের কাগজে আজও এইসব সংবাদ পড়ে মনে হয় কৃষকদের ওপর যে-শোষণ এ পর্যন্ত চলে এসেছে তার এতোটুকুও আজ কমেনি। শত শত বছর ধরে চলেছে তাদের ওপর এই অত্যাচার। ইংরেজদের আসার আগেও ছিল, তাদের সময়েও চলেছে, পরেও চলছে। কৃষকদের ওপর যারা অত্যাচার চালায় তাদের ওপর সমস্ত জীবনভর তারা ঘৃণায় জ্বলে। অত্যাচার যারা চালায় তারা আগেও বধির ছিল—আজও বধিরই। তাই যখন বলা হয়, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ চলে গিয়েছে, এখন স্ফূর্তি কর, তখন কিন্তু তাদের চোখ আনন্দে বা স্ফূর্তিতে মোটেই নেচে ওঠে না।

এই অত্যাচারের রূপ এতো গভীর, এতো দৃঢ় যে তার শিকড় রয়েছে হাজার হাজার বছর পিছনে, প্রসারিত হয়ে। যারা শহরে থাকেন তারাও কৃষকদের ওপর এই অত্যাচারকে যথার্থ মনে করেন। নৈতিকতার এই যে পৃথক-পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী তা শহরেও বর্তমান। এমন বহু মানুষ আছেন যারা এই অত্যাচারকে মনে করেন অন্যায়। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে তারা কৃষকদেরকে অপরাধীও ভাবেন। কারণ, কৃষকরা বোকা, মূর্খ, পশু এবং নিষ্কর্মা। সভ্যতা এবং তার অগ্রগতির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই—নেই বলেই তাদের সাথে এইরকম ব্যবহার। কারা তাদের মূর্খ—বোকা করে রেখেছে ; কারা তাদের সভ্যতার সমস্ত অগ্রগতির থেকে সরিয়ে রেখেছে দূরে।

যদি আমরা আমাদের জীবন এবং সমাজকে সুখ-সমৃদ্ধ করতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই এইসব কারণের অনুসন্ধান করতে হবে। অত্যাচারের সেইসব রূপেকেও দেখতে হবে—যা দু'এক বছর থেকে নয় ; শত শত বছর ধরে কৃষকদের ওপর চলে আসছে। সবচেয়ে মজার বিষয়—এরাও কৃষকদের ওপর অত্যাচারকে দেখে না। এরা অত্যাচারের বিরোধিতা করার জন্য কোনরকম সৃজনশীল ভূমিকা নেয় না ; কিন্তু কৃষকরা যখন নিজেরাই নিজেদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মদত জোগায়—নিজেদের ভিটেমাটি, মা-বোন এবং স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখন তাদেরই ওপর চালানো হয় গুলি। তাদের ওপর পুরোনো অবস্থা বজায় রাখার জন্য পাঠানো হয় পুলিশ মিলিটারী। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাদের বাড়িঘর, ফসল সবকিছু। উল্টে তাদেরই ওপর দোষ চাপানো হয় যে, তারা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। যারা চালাচ্ছে গুলি আর গ্যাস, যারা সরকার আর রাষ্ট্রযন্ত্রকে লাগাচ্ছে কাজে, দিনরাত বল আর হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে, পাঠাচ্ছে পুলিশ আর মিলিটারী, তাদের মুখ থেকে এই দোষারোপ মোটেই শোভা পায় না।

'এ মহাজাগর'-এ কৃষকদের এই নতুন আন্দোলনকেই দেখিয়েছি। অন্ধ্রের মাটিতে যা অঙ্কুরিত হয়েছে। এর আগেও কৃষকরা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছে—কিন্তু সে-লড়াইয়ের সাথে শহরের মানুষের কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি। সারা অন্ধ্র এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে কৃষক আন্দোলন আজ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—তাকে শহরের মানুষ এবার স্বাগত জানাতে এগিয়ে এসেছে। সমাজের সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ শ্রমিকশ্রেণী এই আন্দোলনের ওপর স্থাপন করেছে নিজেদের নেতৃত্ব। তাই তেলেঙ্গানার এই মোর্চা আজ সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের মোর্চা। এই প্রথম কৃষক-সমস্যা তার নিজস্ব গতি এবং নির্ভিকতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই সমস্যা এমন তীব্রতা এবং সত্যতা সামনে এনেছে যে বন্ধু এবং শত্রু—উভয়কেই স্বীকার করতে হচ্ছে, কৃষকরাই সঠিক। তাদের জমি তাদেরই ফিরিয়ে দিতে হবে।

কিছু কিছু মানুষ এই আন্দোলনকে অন্যভাবে ভাঁতানোর চেষ্টা করছে। তারা দাবী জানাচ্ছে জমির বদলে দশগুণ ক্ষতিপূরণের—যে ক্ষতিপূরণ ভারতবর্ষের কৃষক দশ-পুরুষ ধরেও পারবে না আদায় করতে। অন্যদিকে চলছে শ্রীবিনোবা ভাবের 'ভূদান' আন্দোলন। তিনি বলছেন কৃষকদের জমি দান করতে। 'দান কর' যদি সমস্যার আসল সমাধান হত তাহলে এতোদিনে তা হয়েও যেত। দানের নিয়ম-হচ্ছে—একজন ততটুকুই দান

করবে—যা তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখনই সে এই দানের অংশে নিজের প্রয়োজন অনুভব করবে তখনই সে তা রক্ষাও করবে।

'এ মহাজাগর'—বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ কৃষকদের কাহিনী—যে কৃষক তার জমির অধিকার রক্ষার জন্য অত্যাচারীর হিংসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। এ কাহিনী সেইসব কৃষকদের, যারা শ্রম করে। তাই, শহরের শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বকে তারা খারাপ চোখে দেখেনি। শহর এবং গ্রামের মধ্যে যে বিদ্বেষ, তার লেশমাত্রও তাদের হৃদয়ে নেই।

এই কৃষক জাগ্রত এবং সংগঠিত। এরা শুধু মাটিতে হালই চালায় না—বই পড়তে এবং প্রেমও করতে চায়। এরা অন্যের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে না। তারা বলে, এই জমি তো চীরকাল আমাদেরই। আমরা এ-জমিতে দিয়েছি শ্রম, সমৃদ্ধ করেছি একে ফলে-ফুলে। এই শ্রমেই চলে আসছে সারা দুনিয়া। অথচ আমাদেরই ওপর চাপানো হয়েছে জমিদারের জোয়াল। আজ আমরা যখন জমি ফিরিয়ে নেবার জন্য সংগঠিত হয়েছি, তখন তোমরা বলছ আমাদের জমি আমাদেরই দান করবে। একেই যদি ভূদান বলে তবে প্রতিটি চোর আর ডাকাতকেও বলতে হবে দাতা। খুব বেশি হলে তোমরা আমাদের জমিরই একটা ছোট অংশ দান হিসেবে দিতে পারো। এই জমি খুব অল্পদিনের জন্যই আমাদের হাতে থাকবে। মহাজনী ব্যবস্থায় জমি বেশিদিন কৃষকদের হাতে থাকতে পারে না। কারণ, বর্গাদার কৃষকদের কাছ থেকে তা আবার ধীরে ধীরে চলে যায় মহাজন এবং জায়গীরদারদের কাছে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এরকমই হচ্ছে নিয়ম।

'এ মহাজাগর' কৃষকদের কাহিনী, স্থান অন্ধ্রের মাটি। এই কাহিনী আমি কৃষক আন্দোলনের কর্মী বা যারা এর সাংস্কৃতিক ইউনিটের সঙ্গে জড়িত তাদের কাছ থেকেই শুনেছি। এই আন্দোলন সম্পর্কে কাগজপত্রগুলো খুব কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি। কারণ, তা করার জন্য অনুকূল অবস্থা ছিল না। আন্দোলন সম্পর্কে বহু তথ্য পেয়েছি তেলেগুর প্রখ্যাত নাট্যকার এবং কবি ভাস্কর রাও-এর কাছ থেকে।

'এ মহাজাগর' আজ এবং আগামীকালের কাহিনী। আমি শুধু এর সামান্য অংশটুকুই লেখেছি। আরও অনেক কিছু দেখে লেখার ইচ্ছে আগামীদিনে আছে।

এক

রঘু রাও-এর বয়স বাইশ বছর। জেলে আজ ওর শেষ রাত। কাল ভোরেই ফাঁসী।

ফাঁসী সেলে শুয়ে শুয়ে রঘু রাও তার অতীত জীবনের দিকে তাকালো। স্বল্প পরিসর জীবনের প্রতিটি লহমা সে গুনতে লাগলো। কৃষক যেমন তার নিজের টাকাটি পকেটে রাখার আগে বেশ ভাল করে উল্টে-পাল্টে দেখে নেয়, ঠিক তেমনি ভাবেই, সেইরকম যত্ন, সেইরকম সতর্কতা ও তেমনি সংশয়মনা হয়ে রঘু রাও নিজের জীবনের প্রতিটি পল ভালো করে দেখছে। কেননা তার সমগ্র জীবনের ছাঁচটি তার নিজের হাতেই গড়া। ওর জন্ম, মা বাবার কোল, বাবার কাঁধ, এই ধরণের কিছু কিছু লহমা নিশ্চয়ই তার বাপ মায়ের, আর কিছুটা তার সমাজ ও বংশের ট্যাঁকশালের ছাপ নিয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনের বহু মুহূর্ত—যে মুহূর্তগুলির সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে কার্যকরী আর সবচেয়ে দামী ও সুন্দর সবটাই তার নিজের। আর এই লহমাগুলি গড়ে তুলতে ওর নিজের ইচ্ছে ও মেহনতের ভূমিকাটিই ছিল প্রধান, অর্থাৎ সে যা হয়েছে, যা কিছু ভাবনা-চিন্তা, যা কিছু কাজকর্ম সে করেছে, যতটুকু তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে তার সবটার উপরই ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ রয়েছে লেগে। এর ভিতর কোনো দেবতার অনুগ্রহের লেশমাত্র নেই।

প্রত্যেক লোকের জীবনের ছাঁচে কিছুটা থাকে ভালো আর কিছুটা মন্দ। যেগুলির বাছবিচার করার দরকার। নিজের না হলেও পরের জন্তে তো বটেই। শেষ পর্যন্ত হিসেব করে দেখলে অপর লোকও নিজের মধ্যেই তো গণ্য হয়ে যায়। রঘু রাও-এর জীবন তো ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও শেষবারের মতো বিচার করতে গিয়ে গভীর চিন্তা-সমুদ্রে মগ্ন হয়ে যেতেই জেলে আসা জীবনের দিকটা ঘুরে এলো। ওর প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গাঢ় ছাপ ফুটে উঠলো।

রঘু রাও-এর পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী, হাত জেলের দেয়ালে ঠোকা পেরেকের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু তবুও ওর বুদ্ধি ও মন এইসব দুঃখ কষ্ট

উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ও সময়ে জীবনের বিগত দিনগুলির ভাল-মন্দ পরখ করতে লেগে গেল।

অন্য কেউ তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু যারা সময়টাকে দুনিয়ার রাস্তা বলে জানে এবং তার ফলে সময়ের অধীন হয়ে পড়ে রঘু রাও সে ধরণের লোক নয়। দীর্ঘ চেষ্টায় রঘুর এ উপলব্ধিটা এসেছিল যে, সময়টা মানুষের কাছে একটা সাদামাটা মেয়েমানুষের মতো—যাকে নিজের মর্জি মতো গড়ে পিটে নেওয়া যায়, যার সাথে নিজের পরিশ্রম যুক্ত করে মানুষ দুনিয়াটাকে বদলে দিতে পারে। নিজের স্বল্পপরিসর জীবনে রঘু রাও তাই-ই করে এসেছে। তাতে সে কতটুকু সফল আর কতটুকুই বা বিফল হলো আজ জীবনের এই শেষ মুহূর্তগুলিতে সে তাই যাচাই করে দেখতে চায়। এরই জন্য তার জীবনের সমগ্র নক্সাটাকে সামনে বিছিয়ে নিয়ে সে তাদের এক একটি দেখতে লাগলো।

ওর মা। তিন বছরের শিশু রঘুকে রেখে তিনি মারা যান। মায়ের কথা ওর অত্যন্ত আবছা আবছা মনে পড়ে। ওই ডাগর কালো কালো চোখ, স্তন ভরা কাঁচা দুধ, যেন ঠোঁট পর্যন্ত ঝরে পড়ছে। একটি নরম ও গরম কোল। আর মায়ের বুকে হাত রেখে শুয়ে পড়া। ব্যাস এইটুকুই মনে পড়ে। বড় আদরের চুমু খেয়ে এটি ও একপাশে সরিয়ে রাখে।

ওর বাবা ভেরাইয়া, ভেরাইয়া ছিল ওর মা ও বাবা দুই-ই। ছিল ওর বন্ধু। লড়াইতে ওর সাথী, আবার গুরুও। বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের একটি সমন্বয়। রঘু রাও-এর বাবা ইত্যাদি প্রত্যেকে যদি আলাদা আলাদা লোক হত তবে ভালোই হত, জীবনটা মধুর, গভীর আর সুন্দর হয়ে উঠত। কিন্তু সমাজ স্বজনেরও কিছু ছাপ জীবনের উপর থাকে, যার ফলে সম্বলহীন জীবন মাটিতে গুঁড়িয়ে যায়। মানুষকে এই সমাজ ও স্বজনের সাহায্যেই নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ কথাটা এই যে, ভেরাইয়া একজন ক্ষেত মজুর। নিঃস্ব, বেগারখাটিয়ে। এমনই গরীব যে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার মতো সামর্থাও তার ছিল না। ছেলেকে স্কুলে পাঠাবার ক্ষমতাও নেই। তাই তাকে যদি ছেলের স্কুল, মা আর সঙ্গী হতে হয় তবে আর তাতে দোষ কার?

রাও বাবার এই ছবিটি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। ভেরাইয়ার শরীর বেঁটে, মাথা নেড়া। চোখ দুটো ছোট ছোট। নগ্ন পা দুটো কালো আর মজবুত। পায়ে জুতোর প্রয়োজন ছিল না। বড় হয়ে রাওয়ের পা দুখানিও

এইরকম হয়ে গেছে। রাও নিজের পা দুখানি দেখতে চাইছিলো, কিন্তু তার উপায় নেই, ডাণ্ডাবেড়ীতে বাঁধা। সে একটু স্মিত হাসলো।

ভেরাইয়া রাওয়ের জানটা খুব শক্ত করে গড়ে দিয়েছে। কারণ সে ওকে ঠিক মায়ের মতন পালন করতে পারে নি। অবশ্য একটা ক্ষেত মজুরের মা তার ছেলেকে ঠিক মায়ের মতন পালন করতেও পারে না। ভেরাইয়ার তো কথাই নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তার কাটে কঠোর পরিশ্রম করে। কেননা, রামজু, রঙ্কু, গোমাপ্পার মতো তারও কোনো জমি নেই। ওদের গাঁ শ্রীপুরমের আরো অনেকেরই জমি নেই। জমি রয়েছে জমিদারের, এরা সব জমিদারের সেই জমিতে মজুর খাটে। এরা জমিদারের বেগার, গোয়ালা, আর ঘোড়া, দরকার মতো মোরগও। প্রয়োজনে নিজেদের বউ-বেটির দালালও বটে। একটা লোককে যখন তার নিজের জীবনের জন্য এতো কিছু করতে হয়, তখন সে যদি তার ছেলের জানটা খুব শক্ত করে গড়ে না তোলে তখন বুঝতে হবে যে, সে তার ছেলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে।

ভেরাইয়া আর সবকিছু ছিল—কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক পিতা নয়। একজন্যই রাও ছেলেবেলা থেকেই বুভুক্ষু ও খালি পায়ে ঘুরে ফিরে জীবনের নীরস ফুল থেকে কোনো না কোনো প্রকারে অল্প স্বল্প রস নিঙড়ে নিতে শিখেছে। এর বেশি ধারণা তার নেই। ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ওদের সমাজের চেহারা এমনই যে ওর আশা আকাঙ্ক্ষা এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হয় নি। সম্পূর্ণটা ঠিক মনে নেই। তবে এটা ওর ভাসাভাসা মনে পড়ে যে, ও যখন খুব ছোট আর জানুয়ারি মাসের সকালে ও বিছানায় শুয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে চাইত, তখন ওর বাবা ওকে পিঠে বেঁধে নিয়ে জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে চলে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও কাঁদত। বাবার সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা, কান্নারত ছেলেটাকে পিঠে ফেলে সে জমিদারের তুলো ক্ষেতে ফুল তুলছে, ফলে ও কেঁদে কেঁদে চুপ করে যেতে শিখে গেল। দুধের বদলে তেঁতুল পাতার চাটনি খেতে শিখল। নিজের হাতে রুটি তৈরি করতেও শিখল। ও নিজে ক্ষেতে কাজ করতে না শেখা পর্যন্ত দীর্ঘকাল বাবার জন্য রুটি তৈরি করে ক্ষেতে নিয়ে যেতে লাগলো, এটা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। প্রথমে ও বাজরা চাউলের মতো জল দিয়ে ফুটিয়ে তারপর পিষে পাতার চাটনি করে নিত। শেষে দুটো কলার পাতায় বেঁধে ওর বাবার কাছে ক্ষেতে নিয়ে যেত। কখনো কখনো জমিদারবাড়ি থেকেও লপসী এসে যেত। লপসী আর

চাটনিতে ভাত খেয়ে ক্লান্ত বাহুতে শক্তি এসে যেত। জেরাইয়া ফসল কাটতে লাগত আর রাও কাটা ফসল এক জায়গায় জড়ো করত। শেষে এমন দিনও এসে গেল যখন রাও নিজে বীজ বোনা ও ফসল কাটা এবং দুটি কাজেই আগা গোড়া লেগে রইতে শিখল। এখন ও পুরো ক্ষেত মজুর হয়ে গেছে। ভারবাহী গাধা যেমন অত্যন্ত প্রীতির সাথে নিজের ভারবাহী ছেলের দিকে চায়—ঠিক তেমনিই গোলাম বাবা তার গোলাম ছেলেকে সগর্বে দেখে। পিতৃস্নেহ এই যে ছেলেটার বোঝাটা একটু কম করে দেয়, ছেলের ভালবাসা হোল এই যে, বাবার বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। অন্যদিকে জমিদারের ধারা হচ্ছে যে, সে দুজনের উপরই বোঝাটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যায়।

রাও এই নক্সাটিকে আবার উল্টে-পাল্টে দেখলো। আকৃতি রং ও গরিবী। ওর বাবা আর ওর মধ্যে কত বিষয়েই না মিল। আকৃতি ও রংটা তো সে বদলাতে পারে না। সেটা করার তার কোনো ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্যটাকে সে নিশ্চয়ই বদলাতে চেয়েছে, এই ইচ্ছেটা তার কেবল যৌবনেই জাগে নি। তারও বহু আগে, শৈশব থেকেই ইচ্ছেটা জেগেছে। কোনো কোনো ছেলেকে স্কুলে যেতে দেখে বই, স্কুল, ভাল ভাল কাপড় নিজে পেতে, ছুঁয়ে দেখতে ও পছন্দ করতে একটা দারুণ উৎসাহ ওর মনের মধ্যে জেগেছিল। কিন্তু জেরাইয়া খুব শিগগিরই বুঝিয়ে দিল যে, সেটা হওয়া অসম্ভব। গোলামের ছেলে গোলাম-ই হয়। জমিদারের ছেলে জমিদার নম্বরদারের ছেলে নম্বরদার আর পুরুতের ছেলে পুরুতই হয়। ওইরকমই কোনো কোনো ছেলে স্কুলে যায়, আবার কেউ কেউ ক্ষেতে ফসল কাটে, তাতে কোনো দোষ নেই। হাজার হাজার বছর থেকে এইরকমই চলে এসেছে, আর হাজার হাজার বছর এইরকমই চলবে। রাও চুপ করে যেতেই বাবা বুঝলো যে, ছেলে ওর মতোই হার মেনে গেছে। কিন্তু ঘটনাটা কি এইরকমই হোল ?

এইবার রাও নিজের জীবনের আরেকটা মুহূর্ত উঠিয়ে নিল। ওর বয়স তখন এগারো বছর। ওদের গাঁ শ্রীপুরমে তখন বড় একটা মেলা লেগেছে। আর এইরকম মেলা প্রত্যেক দশবছর বাদে আসে। তালপাতার হাওয়া সারা শ্রীপুরমে খুশির লহর ছুটে যায়। জেরাইয়া এই প্রথমবার তার ছেলেকে আগাগোড়া নতুন কাপড় দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে—খদ্দরের ধুতি, কোর্তা, মাথায় খদ্দরের পাগড়ী আর গলায় একটা কালো যন্তরমন্তরের কবচ। কবচটা

একটা সাধু ওকে দিয়েছিল। সেদিন রাও ভগবতী নদীতে স্নান করে আর চকচকে কাপড় পরে ভারী খুশি হয়েছে। তাড়াতাড়ি ভাত আর পুড়া খেয়ে নিয়ে সে বাবার সাথে গাঁয়ের প্রান্তে একটা খোলা জায়গায় গেল। সেখানে মেলা বসেছে। রাস্তায় গাছের নিচে ছেলেরা কপাটি খেলছে। একটা বড় বুড়ো গাছের নিচে ছোট ছোট মেয়েরা খেলা করছে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শক্ত উঁচু পাথরের রাস্তা সুরু হয়েছে। সেইখানটায় মেলা। মেলায় হরেক-রকমের বাসন চুড়ি চিরুণী আর তেল এসেছে, তামাক আর গুড়ও উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেপুলের জন্য মাটির খেলনা, তালপাতার বস্তা, একধারে জাপানী রেশমের কাপড়ের দোকান। সেখানে রাও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। আহা! কাপড় এত সুন্দর হতে পারে। এত মনোহর আর নরম। ওর মনে আছে ও এগিয়ে গিয়ে রেশমের একটা থান নিজের হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছিল। কেননা, এটা কি সত্যি যে একখান কাপড় মানুষের স্বপ্নের মতো এত নরম, এত চমৎকার ও এত রূপসী হতে পারে? তাই ও নিমেষের জন্য কাপড়ের থানটা ছুঁয়ে দেখে নিল। ঘটনাটি কত বছর পরে আজও এই কাঁসী সেজে একটা রূপোর টাকার মত আওয়াজ দিয়ে উঠছে। বহুক্ষণ ধরে রাও এই সময়টির কথা ভাবতে এবং মনের মধ্যে তার গুঞ্জন শুনতে লাগল। তার হাত এই নক্সাটির উপর ঘুরতে ফিরতে থাকে।

ওর আরো মনে পড়ে যে, দোকানের মালিক রামাইয়া শেঠি ওকে ধমকে দিয়েছিল: গোলাম হয়ে রেশমে হাত দিয়েছিস বদমাস কোথাকার? মেরে একেবারে ভূত ভাগিয়ে দেবো। এইসময়ে ওর বাবা তাড়াতাড়ি রেশমের থান থেকে ওর হাতখানা সরিয়ে দিয়ে ওকে নিয়ে আগে আগে চললো। রাওয়ের মনে হয়েছিল জীবনের নগ্নতা শুধু ওর জন্যই। জীবনের রেশম মসৃণতা আর কোমলতা ওর জন্য নয়।

রাওএর নজর এবার একটা বিকৃত ছবির উপর পড়লো যেটি ও ওর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাজারে উল্টে-পাল্টে কিছুতেই বেচতে পারলো না। এটি না ওর, নিজের না ওর বাবার, এটি ছিল সমাজের। রাওয়ের মন হঠাৎ বড় উদাস হয়ে গেল। ওর বাবা বোঝালেও ভুলতে পারলো না। ওর বাবা ওকে দোলায় চড়ালো এবং সরবৎ খাওয়ালো, মন কিছুটা শান্ত হোল। কিন্তু তবুও কিছুক্ষণ ওই রঙিন রেশমী কাপড়ের জন্য ওর মনটা কচ্ কচ্ করতে থাকলো।

সন্ধ্যের সময় বাপ-বেটা মেলা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। জমিদারের

কর্মচারী ভিমাইয়া ও দরগাইয়ার সঙ্গে ওদের দেখা। দুজনেরই চোখ মদ খাওয়ার লাল হয়ে উঠেছে। দুজনেরই হাতে পিস্তল। ওরা বাপবেটা দুজনকে দেখেই ঘিরে ফেললো।

ভেরাইয়া জিজ্ঞেস করল : ভাল তো ?

দরগাইয়া বলল : সোজাসুজি যদি চলে এসো তবেই সব ভালো।

কোথায় যেতে হবে ? ভেরাইয়া জিজ্ঞেস করলো।

'সূর্যপেটা বেগার দিতে। এখনই, এই সময়েই যেতে হবে। জমিদার ডেকেছেন।'

'কিন্তু আজ তো মেলা'—চমকে উঠে রঘু বলল।

ভিমাইয়া ওর বুকের কাছে জামাটা ধরে দুই গালে দুই থাপ্পড় লাগিয়ে দিয়ে মাথার পাগড়ীটা খুলে ধুলোয় ফেলে দিল। রাও মারামারি করার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভিমাইয়া বড় জোয়ান আর ও ছেলেমানুষ। এইজন্য যখন দরগাইয়া ওর বুকের উপর পিস্তল ধরলো তখন ভেরাইয়া দৌড়ে এসে দরগাইয়ার হাত ধরে হড়বড় করে বল্লে : 'মালিক, এ তো ছেলেমানুষ, একি জানে যে আমি বেগারী, সরকারের গোলাম। পুরো মেলার সময়েও যদি জমিদারবাবু ডাকেন তা হলেও যাব।'

'কেন যাবে ?' রাও রাগ করে বললো।

'চুপ কর না—।' ভেরাইয়া নিজের ছেলেকে একটা ঘুষি মারলো। রাওয়ের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। ভেরাইয়া আজ পর্যন্ত ওর ছেলেকে কোনদিন মারে নি। সবিস্ময়ে রাও ওর বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। সেজন্য চোখের জল মোছার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি। হাঁ, চোখের জলটা যখন গড়িয়ে নিচে নেমে এলো অমনি বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকাতেই নিজের হাতখানা দিয়ে সেটা মুছে নিল। গড়ান রক্তের খানিকটা সে চুষে খেয়ে খানিকটা থু করে ফেলে দিল, কিছু বলল না। ভেরাইয়া নিজের ছেলেকে গালাগালি দিয়ে বললো : 'চলুন মালিক, আমি বেগারী, আমি মালিকের বেগার খাটবো। আমার ছেলেও বেগারী। সেও যাবে। ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গোলামদের আবার মেলা ফেলার মানে কি ?'

'এখন সোজা হয়ে এসেছে। শালা নতুন কাপড় পরে সামনে এসেছে।' দরগাইয়া রাওকে একটা ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো। ভেরাইয়া হাত জোড় করে বলল : 'বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে, মালিক। আমি তো ওকে বারণই করেছিলাম। বদমাসটা কি তা শোনে ; বলতে

লাগবো, আজ মেলা, নতুন কাপড় পরবো। জানিসনে মালিকের সামনে কেউ নতুন কাপড় পরতে পারে?'

'জানি।'

'তবে?'

'মালিক মাফ করে দিন, ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম গাফিলতি হবে না।' ভিমাইয়া বললো : এইজন্যেই তো আমি ওর কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছি। ভবিষ্যতে ও কখনো আর এরকম গাফিলতি করবে না। 'গোলাম, গোলামের মতোই থাকা উচিত।'

'ঠিকই বলেছেন হুজুর।'

ভিমাইয়া ও দরগাইয়া মেলা ও গাঁ থেকে আরো পঞ্চাশ-ষাট জন গোলামকে একত্র করে তাদের ভেড়ার পালের মতো খেদিয়ে জমিদারের দেউড়ির দিকে নিয়ে গেলো।

জমিদারের গড়টা বেশ উঁচু। গড়ের ফটকটি বেশ উঁচু আর চওড়া। এই গড়ের ভিতরেই জমিদারের ঘর, কোনো বেগারী আজও পর্যন্ত দেখে নি। রাও-এর এই প্রথমবার গড়ে আসার সুযোগ মিলেছে। গড়টি সে দূর থেকে দেখেছে, এক দুই দফায় হিম্মত করে গড়ের কাছাকাছি এসে ঘুরেও গেছে। শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু গড়ের ভিতর পা ফেলার সাহস ওর কখনো হয়নি। শিশুমনে যে অনুসন্ধিৎসার প্রবণতা দেখা যায় রাও-এরও সেটা ছিল। তাই আজ মার খাওয়া, কাপড় ছেঁড়া এবং জমিদার আর তাঁর চমৎকার গড় সত্ত্বেও সে বড় খুশি মনে গড়ের এধার ওধার ঘুরে দেখতে লাগলো। ওর বাবা ওর ঘাড়টি ধরে জোরে সাঁমনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল : 'ওপরের দিকে তাকাসনে, পায়ের দিকে তাকা নতুবা মালিক চটে যাবেন।'

এই সময় রাও এক পলক দেখে নিল যে, মাথা নিচু করে, চোখগুলি পায়ের দিকে রেখে গোলামরা সারি সারি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাও-এর কানে একটা কর্কশ আওয়াজ এলো : দরগাইয়া। 'জি মালিক।' দরগাইয়া বলল.।

রাও কিন্তু ভয়ে ওপরের দিকে তাকাতে পারলো না।

'কতগুলো বেগারী এনেছিস্?

'দুই কম ষাটটা হুজুর।'

'বেশ, কাজ চলে যাবে। কিন্তু খাওয়ার বন্দোবস্তোটাও করে নিন ওদের বহুৎ দূর যেতে হবে।'

'এরা সব খানা নিজেরাই সাথে করে এনেছে, হুজুর।' তিমাইয়া বলল। তেরাইয়া নিজের মনে মনে ভাবলো : এটা তো বিলকুল মিথ্যে।

'আচ্ছা, আচ্ছা তবে চল, তৈরি হয়ে নে।' আবার সেই কর্কশ ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল।

দুই

ভিয়াইয়া ও দরগাইয়া বেগারীদের আবার উল্টোমুখে গড়ের বাইরে নিয়ে এসে ওদের ওপর জিনিষপত্র চাপাতে শুরু করে দিল। অনেক জিনিষপত্র। কেননা, সূর্যপেটে জমিদারের ছেলের বিয়ে। তাই জিনিষপত্র অনেক আর সঙ্গে চারটি পাল্কী। একটি হোল জমিদার জগন্নাথ রেড্ডীর জন্য। জগন্নাথ রেড্ডী শ্রীপুরম, পাত্তিগড়ু আর আশপাশের চল্লিশটি গাঁয়ের একচ্ছত্র মালিক। দ্বিতীয় পাল্কীটি হচ্ছে জগন্নাথ রেড্ডীর ছেলে প্রতাপ রেড্ডীর। সূর্যপেটে যার বিয়ে। তৃতীয় পাল্কীটি প্রতাপ রেড্ডীর মায়ের—এই উপলক্ষে যাঁর সূর্যপেট যাওয়া একান্ত দরকার। প্রথম দুটি পাল্কী খোলা, কিন্তু তৃতীয়টি বন্ধ। চতুর্থ পাল্কীটি বন্ধ কিন্তু এই পাল্কীটি নতুন, রঙিন আর ভারী চমৎকার। দুপাশে লাল রেশমের পর্দা ঝোলানো। অল্প একটু হাওয়াতে সেগুলি দুলে উঠছে। বন্ধ করা কাঁচের শার্শিগুলি ঝনঝনিয়ে উঠছে—যেমন লাওট খেলতে গিয়ে অনেক মেয়েরাই একদম হেসে ফেলে। রাও অত্যন্ত খুশি, আশ্চর্য হয়ে বন্ধ করা পাল্কীটির দিকে দেখছিল আর বাবার কাছে জিজ্ঞেস করছিল। কিন্তু নিজের বাবার কাছ থেকে প্রশ্নের জবাবে একটা ঘুসির বেশি আর কিছু মিললো না।

দেড়ঘণ্টা-দুঘণ্টা সোরগোল করার পর জমিদারবাবু সদলবলে গড় থেকে রওনা হলেন। এক একটি পাল্কীতে আটজন করে বেগারী। প্রথম পাল্কীটি মালিকের। দ্বিতীয়টি ছেলের। তৃতীয়টি মালিকের স্ত্রীর আর চতুর্থটি খালি। রাও বুঝতে পারল না কেন। ভেরাইয়ার ডিউটি পড়েছে মালিকের পাল্কী ওঠানোর আর রাও-এর ভাগে একখানি খুব বড় আয়না নিয়ে যাওয়ার। এ আয়নাখানায় ও নিজের চেহারাটা বার বার দেখে খুশি হচ্ছিল। কিন্তু তবুও আয়নাখানা উঠিয়ে নিয়ে ও চতুর্থ পাল্কীটির পাশে পাশে চলতে শুরু করে দিল। পাল্কীবাহকদের মধ্যে বাবার বন্ধু-বান্ধবও ছিল। এইজন্যই রাও ওর কাছাকাছি চলতে লাগল। যখন দেখল যে

তৃতীয় ও চতুর্থ পাল্কীটির মাঝের দূরত্বটা কিছু বেড়ে গেছে তখন এবার ওবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল :

'কাকা এ খালি পাল্কীটি কার ?'

'আমি কি জানি ।' রেগে গিয়ে রঙড়ু জবাব দিল ।

'বলনা কাকা ।' রাও একটু সলজ্জ ভাবে বললো ।

জমিদারের গোমস্তারা ওকে ধরে নিয়ে এসেছে বলে রঙড়ুর মেজাজটা আজ বড়ই চটা । বছরের সব দিনগুলিই মালিকের, কিন্তু মেলার দিনটি থাকে শুধু গোলামদের । তাই আজ রঙড়ু কোনো কথারই ঠিক জবাব দিতে চায় না । ছেলেটার খুশি আর আগ্রহ দেখে ওর মনটাও কিছুটা নরম হয়ে গিয়েছে ।

রঙড়ু এদিক ওদিক দেখে বললে : এটাতে জমিদারের মার (গালাগালি দিয়ে) কনে আসবে ।

'কে ?' রাও কিছুই বুঝতে পারলো না ।

'ওর (গালাগালি দিয়ে) ব্যাটার (গালাগালি দিয়ে) মার (গালাগালি দিয়ে) ও আসবে ।'

রাও এবারও কিছু বুঝতে পারলো না । অবাক হয়ে রঙড়ুর দিকে তাকিয়ে রইল ।

রঙড়ু মাটিতে থুতু ফেলে বলল : আজ থেকে এক বছর পরে যখন মালিকের ছেলের বিয়ে হবে তখন সূর্যপেট থেকে এই পাল্কীতে করে কনে শ্রীপুরমে আনতে হবে । সে সময়েও তোকে আর আমাকে গিয়ে আনতে হবে ।

জমিদারের একজন গোমস্তা এসে রঙড়ুকে একটা গুঁতো মেরে বলল : শুধু কথাই বলবি, না আগে যাবি ? দেখছিস তৃতীয় পাল্কীটা কত আগে চলে গেছে ? রঙড়ু ও আরএকজন গোলাম পাল্কীটাকে তুলে নিঁয়ে খচ্চরের মত টগবগ করে জোর কদমে চলল । রাও-ও আয়নাখানা তুলে নিয়ে ছুটলো ।

শ্রীপুরম থেকে সূর্যপেট যাওয়াটা কষ্টকর । কিন্তু এবারকার যাত্রার দুটো কথা ও কখনো ভুলবে না । একটি এই যে, গাঁ থেকে দূরে গিয়ে একটি পাহাড়ী রাস্তা চড়ে একটি চড়ির মোড় ঘুরে যখন আপনার গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল ওর আয়নাটার, গাঁ খানা ঝকমক করে উঠলো । প্রসারিত জুনোর ক্ষেত । জুনো—যাকে অন্ধ্রের বরক বলা হয় । তালপাতার ছাওয়া

ঘর। ঘরগুলির মাঝে মাঝে কালো কালো পাথরের চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের ওপারে পা আর চিন্তা গাছের সার—সন্ধ্যায় যাদের প্রসারমান ছায়ায় পাখিরা রাত্রিবাসের জন্য আসে। সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনার ভাগী হলেও রাও-এর কাছে নিজের ঘর নিজের গাঁ, পুকুর বড়ই সুন্দর মনে হলো। আজ পর্যন্ত ও কখনো এতদূর থেকে নিজের ঘর, গাঁ দেখেনি। তাই দূরত্ব জীবনে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, সেটি ওর মনের আয়নায় একটি আলোড়ন তুললো। ঘরবাড়ি, গাঁ আর দেশের এই মোহিনীমূর্তির সুখস্মৃতি কখনোই মুছে যেতে পারে না। আজ এই ফাঁসী সেলে শুয়ে চোখ বুজেও সেই মোহিনীমূর্তি দেখতে পায়, স্পর্শ করতে পারে। এই সুন্দরী মূর্তিকে পরখ করা ছোঁয়া, চোখে দেখা ও জানিয়ে দেওয়ার অধিকার ওর আছে। কেননা ও জীবন-ভোর এরই জন্যে লড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় যে কথাটি ওর মনে আছে, সেটি ওর গাঁয়ে নেই। সেই কথাটি সূর্যপেটের একটা বড় আস্তাবলে বসে ওর মনে হয়েছিল। গাঁয়ের পাটোয়ারী শ্রীরামাপগুপ্, পুরোহিত শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী, পুলিশ সর্দার শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রাও এবং আরো অন্যান্য গণ্যমান্য নিমন্ত্রিতদের ঘোড়াগুলো রাখা হয়েছিল একটা আস্তাবলে। গাঁয়ের বেগারীদের ঠাঁই দেওয়া হোল সেই আস্তাবলে। কিন্তু যে কথাটি ওর মনে ছিল সেটা ঘোড়ার গন্ধ নয় বা আস্তাবল, তার গন্ধও নয়, খালি মেঝেটার ঠাণ্ডা ও কাঠিন্যের কথাটিও নয়। সেটি হল বুররা কথা। পত্তিপাড়ুর কথকের কাছ থেকে আজ রাতে ঘোড়ার আস্তাবলে বসে সেই বুররা কথা শুনেছিলো। এই কথকও জগন্নাথ রেড্ডীর প্রজা। বিয়ের পাকা-দেখার শুভলগ্নে তাকেও ডেকে আনা হয়েছে। এরা তিনজন, একজন সাদা দাড়িওয়ালা, যে প্রদীপ দেখায়, প্রদীপের আলোয় লোকটার চেহারাখানা অন্ধ্রের লাল মাটির মত চক্‌চক্ করছে। অন্ধ্রের বুকে ক্ষতের মতো ওর দেহেও লাল চর্মের কুঞ্চন। তার এক হাতে একটি একতারা। প্রকাণ্ড একটি পাগড়ী মাথায় দিয়ে একজন যুবক ভাঁড় সেজেছে। চেহারাটায় যেন জীবনের স্ফূর্তির ঝলক। যেন ভরামধুর চাকে মধু ঝলকাচ্ছে, যে জীবন কখনো হার মানা জানে না। কথকের কথার মধ্যে হঠাৎ উল্টো-সোজা কথাবার্তা বলে লোককে হাসানোই এর কাজ। তৃতীয় কথকের হাতে একটা বুররা। যেটি মৃদঙ্গের মতো বাজে।

রাত গভীর ও নিস্তব্ধ। ঘোড়াগুলো শুকনো বাজরা আর গোলাময়া সিদ্ধ বাজরা দিয়ে আপন আপন উদরপূর্তি করে নিয়েছে। কথকরা এখন যেখানে

ঘোড়াদের জল খাওয়ানো হয় সেই পুকুরের কিনারে প্রদীপ জ্বালিয়ে তার আলোয় কথকতা শুরু করে দিল।

কথক মৃদঙ্গ বাজিয়ে বলল : আজ থেকে অনেকদিন আগে……

ভাঁড় ঠাট্টা করল : যখন জগন্নাথ রেড্ডী জন্মান নি।

কথক বলল : অনেক বছর আগে……

ভাঁড় বলল : যখন বেপারীরা সাদা চাল খেত, সাদা রেশমের কাপড় পরত।

কথক বলল : আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে ওয়ারঙ্গলে কাকতীয়া বংশের সম্রাজ্ঞী রুদ্রমাদেবীর রাজত্বকালে বেলিম পল্লীর গাঁয়ের পাশে একজন যোগী বাস করত……

কথা শুরু হয়ে গেছে। মৃদঙ্গ, একতারা ও হাসিকারের চুটকি। মধু মধুর অতীতের এক পুরনো মহান অন্ধ্রের মাটিতে গিয়ে পৌঁছলো। বেপারীরা আপনাদের সব সুখ দুঃখ ভুলে গিয়ে গল্পে মজে গেল। গল্পে ছিলেন একজন সুন্দর যোগী আর রূপবতী এক রাজকুমারী। রাজকুমারীর বাবা ছিলেন বিষ্ণু মতের পূজারী এবং যোগী ছিলেন শিবের। যোগী সংসারে এসেছেন অত্যাচারের অবসান করার জন্য। তিনি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে চলেছেন—এমনি এক সময়ে রাস্তায় রাজকুমারীর সাথে দেখা……

বহুক্ষণ ধরে একতারার সুর থরথর করে আকাশে কাঁপতে থাকল। বেপারীদের বিস্ফারিত চোখের তারায় রাজকুমারীর চেহারাটি দুলতে থাকে। পুকুরের জলে প্রদীপের শিখা ঝলমল করে। আকাশের তারাগুলো মিট মিট করে তাকাতে থাকে। রাও বুঝতেও পারল না সে কতক্ষণ পর্যন্ত জেগে ছিল, কখনই বা ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্যের প্রথম কিরণ চোখের পাতায় পড়ায় ও জেগে উঠেই বুঝতে পারল যে, রাতের স্বপ্ন টুটে গেছে। এবং আর একটা দিন এসে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে রাও দেখল যে, তার বাবা তখনও শুয়ে। ঘোড়াগুলো হিঁ হিঁ করছে। বিছানো-ফরাসটির উপর বারবার গরম মেজাজে খুরের খটাখট আওয়াজ করছে।

এরপর বহুক্ষণ রাওএর মনটি ফাঁকা। কোথাও কোথাও জীবনের ছিন্ন সুর, ছোট ছোট ঘৃণা বুদ্‌বুদের মতো মনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ও কিন্তু সেদিকে মন দিল না। এইসব ঘৃণার মধ্যে জগন্নাথ রেড্ডী, প্রতাপ রেড্ডী, পুলিশ পেটেল, ও গাঁয়ের অন্যান্য মালিকদের ছবিও বারবার সামনে এসে

পড়ছে। কিন্তু এসময়ে সে এদিকে বেশি নজর দিল না, কেননা ও জানতো যে ওর মনে যে অঙ্কুর মাথা তুলেছে তার উর্বর জমিতে ঘৃণার খাদ অনেকখানি থাকলেও নিচ ও সংকীর্ণ ঘৃণার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ও বহুমুহূর্ত ডিঙিয়ে চলে এলো। বহু নকসায় শুধুমাত্র হাত লাগিয়েই পাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে শিশুকাল থেকে যৌবনে এসে পৌঁছে যায়। আর এইখানে এসেই ওর বন্ধু নাগিশুরের কথা মনে পড়ে। যে নাগিশুর ওর মতোই দ্বিতীয় কোনো একটা ফাঁসীসেলে বন্দী।

নাগিশুর রঘু রাও-এর মতো বেঁটে খাটো নয়। বরং ছফুটের ওপর লম্বা। তার শরীর যেমন লম্বা, তেমনি তার লাঠি এবং উচ্চহাসি। নাগিশুর ভগবতী নদীর ওপারের জঙ্গলে গরু আর মোষ চরাতো, গান গাইতো, যখন রাও-এর বেগারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ইচ্ছে হত তখন নিজের ঘরে তাকে আশ্রয়ও দিত। নাগিশুর আর রাওএর বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিল ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে নয়, ঘৃণার মধ্যে। নাগিশুর জমিদারকে ঘৃণা করত এই কারণে যে, জমিদার বছরের মধ্যে দু চারবার বিনা পয়সায় ওর কাছ থেকে ভেড়', ছাগল তলব করে নিত। রাও-এর ঘৃণাটা ছিল, সে তাদের গোলাম ছিল বলে। কিন্তু ভেরাইয়া ওকে বলেছিল যে ওরা কোনো একসময়ে জমিদারের গোলাম ছিল না। তখন ওদের ছিল জমি, হাল আর বলদ। ওদেরও ছিল তুলোর ক্ষেত, সোনার ফসল। হাসি-খুশি শিশু ও গীতকণ্ঠি বউ ওদেরও আঙিনায় ছিল। বড় রাগ ও তেজের সঙ্গে ভেরাইয়া আরো বলেছিল যে—'বেটা রঘু! ঐ যে সামনে জমিদারের মনোরম গড় দেখছিস, ঐ গড়ই আমার সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করে দিয়েছে। বাবা আমার; ঐ উঁচু গড়ই আমার বংশের দুষমণ। বেটা; আমার বাবা আমাকে এই ঘৃণা সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমিও তোকে এই ঘৃণা সঁপে দিয়ে গেলাম। লোকে ছেলেকে ধন সম্পত্তি দিয়ে যায়, ঘরবাড়ি দিয়ে যায়। বউ এনে দেয়, জায়গা জমিন দেয়, কিন্তু আমার কাছে তো কোনো জমি নেই, রয়েছে শুধু এই ঘৃণা। এই ঘৃণাই আমি তোকে দিয়ে গেলাম। বোঝা বইতে বইতে আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আর আমার কোনো শক্তি নেই। শক্তির রাস্তাটাও জানা নেই। আছে শুধু এই ঘৃণা, সেটি আমি তোর জিম্মায় রেখে গেলাম। যদি কোনো রাস্তা খুঁজে নিতে সক্ষম হোস তবে খুঁজে নিস।'

সেইদিন থেকে রাও এই পবিত্র ঘৃণাকে একটি মহৎ উত্তরাধিকারের মতো

উঠিয়ে নিয়ে নিজের মনের মধ্যে রেখে দিয়েছে, নিজের জীবনের শিক্ষা এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবন ওকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, জমিদারের গড়টি শুধু ওরই শত্রু নয়, রামলু, রঙ্গড়ু, সোমাপ্পা, ভেঙ্কটরাও-এর মত শত শত বেগারীদের বংশের শত্রু ; যাদের সোনার ফসল, ক্ষেত, গান, ঘর, তুলোর ফুল, আর বউয়ের হাসি—এই গড় চুরি করে নিয়েছে। এই ঘৃণাই হল নাগিশুর আর রাও-এর বন্ধুত্বের বুনিয়াদ। ঘৃণাই শুধু রাও-এর মনে এই খেয়াল এনে দিয়েছে যে, দুনিয়ায় প্রতাপ রেড্ডীরা অল্প, বেগারীর সংখ্যাই বেশি। এই বেগারীরা যদি নিজেদের মধ্যে একতা গড়ে তোলে তবে ঐ গড়ের দেয়াল বেশিদিন আর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এই দেয়ালটি হঠাৎ একদিনে ওর মনে একটা আকার নিয়ে আসে নি। খুব আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে আবছা পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে এই তত্ত্বটি তার কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু যে জিনিষটি এই ঘৃণাকে একটা মহৎ অনুপ্রেরণায় রূপ দিয়েছে, সেটি জমিদারের প্রতি ঘৃণা নয়, জীবনের প্রতি প্রেম ভালোবাসা।

রাও আবার ধীরে ধীরে জীবনের মুঠি খুললো। ঘৃণায় জ্বলা অনেক মুহূর্তগুলির মাঝে ঝলমলে একটা প্রেমের ফুলকে দেখে ওর চেহারাটি একদম দীপ্ত হয়ে উঠলো।

চন্দ্রী!

রাও-এর তিন বছর আগেকার একটি ক্ষেতের কথা মনে পড়ে। ক্ষেতটি তুলোর ফুলে ফুলে বরফের মত শাদা হয়ে গেছে। ও সকাল থেকে তুলোর ফুল তুলছে। কখনো কখনো শাদা ফুলের সঙ্গে ছাইরঙা ফুল এসে গেলে সেটাকে আবার বেছে নিয়ে আলাদা ঝোলায় রাখছে। হঠাৎ শাদা ফুলের সঙ্গে নরম বড় ফুল এসে গেলে সেটাকে নিয়ে আরেক ঝোলায় রাখছে। বহুক্ষণ ধরে খুব তাড়াতাড়ি ও আজ ক্ষেতে কাজ করছিলো, এবং নিজের হাতও চালাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি। কেননা, আজ ওর বাবা অসুস্থ আর সেইজন্যেই একজন ক্ষেত মজুরকে দুটো ক্ষেত মজুরের কাজ করতে হচ্ছে।

ও কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে গুন গুন করে গান গাচ্ছিল। যে মেয়েটি ক্ষেতের অপর প্রান্তে ফুল তুলতে তুলতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তাকে দেখে নয়, নিজের হাতের ক্লান্তি ভোলার জন্যেই, গানের আওয়াজের সাথে নিজের ভালোবাসার আওয়াজ মিশিয়ে দেবার জন্যই গান গাইতে গাইতে হঠাৎ ও চুপ করে গেল, কেননা ওর সামনের ঘন তুলোর গাছগুলোর

ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে ফেললো। রাও ফাঁসি সেলে শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে চোখ দুটো বন্ধ করে। প্রথমবার চন্দরীকে যেমনভাবে দেখেছিল তেমনিভাবে দেখতে থাকে।

প্রথমেই চন্দরীর সাদা দাঁতের কথা মনে এলো, ঠোঁটের মাঝখানে ছোট ছোট দাঁতগুলি মোতির মালার মতো ঝকঝক করছে। চন্দরীর ব্লাউজ—একদম লাল ব্লাউজ। তার উপর আয়নার মতো ছোট ছোট ঝিনুক বসানো। চন্দরী যখন ঘাড় নিচু করে পিছনের দিকে ফিরে দেখলো তখন ও বুঝলো যে, ব্লাউজটা পিছন থেকে খোলা। লাল সুতোগুলো গোলাপের পাপড়ির মতো তার পিছনের সাদা অংশটায় ছড়িয়ে পড়েছে। চন্দরী যখন তাড়াতাড়ি ওর দিকে ফিরল তখন মনে হল যে তার মাথার চুলে লাল মখমলের একটি গুছি ঝুলছে। যখন ওকে একটু মুচকি হেসে এবং কিছুটা ঘাবড়ে দিয়ে ঘাগরার উপর আঁচলটা দুরস্ত করছিলো তখন ওর মনে হল আঁচলটাও গাঢ় লাল রঙের ফুলদার। আঁচলেও গোল গোল আয়না বসানো, রোদে ঝকঝক করছে এবং তুলোর শাদাতে মিশে চোখ ঝলসে দিচ্ছে। চন্দরী যখন তুলোর ফুল তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল তখন ওর মনে হল যে, ওর হাতে প্রথম রয়েছে কালো শিংয়ের চুড়ি। আঙটিতে সবুজ হরফে ওর নাম খোদাই করা। মাথার টিকলিতেও ঐরকম খোদাই। টিকলি থেকে ওর চোখ আরও নিচে নেমে এসে বহুক্ষণ ধরে নীলাভ চোখগুলির মধ্যে হারিয়ে গেল। নীলাভ চোখ…খুব পরিষ্কার খোলা রং…উঁচু আর পুরন্ত চেহারা…পাতলা ঠোঁট।

চন্দরী— !

এই সবই মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

পরমুহূর্তে একটু হাসলো। কিন্তু এই দ্বিতীয়বারের মুচকি হাসির মুহূর্তটি প্রথমবারে দেখার মুহূর্তটির মতো দরকারী নয়। এই প্রথম মুহূর্তটি কতবার মনে এসেছে। জঙ্গলে ঘোরার সময়, পুলিশ আর ফৌজকে এড়িয়ে চলার সময়, কাগজের কারখানায় কাজ করার সময়, পাহাড়ের গুহায় বসে, জমিদারের চাবুক খেতে খেতে, জেলে অনশন করার সময়ও এই মুহূর্তটি মনে এসেছে, এর.থেকে শক্তিও সঞ্চয় করেছে। আবার কয়েকবার নরম, মিষ্টি ও দুর্বল বোধ করে এটাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কতবার আবার এই মুহূর্তটিই বিনা আহ্বানে হঠাৎ তার মনে উদয় হয়ে বড় কষ্ট দিয়েছে। মরুভূমির মাঝখানে কোথাও জল নেই। তৃষ্ণার্ত সে, সময় জল মদ হয়ে এসে যেরকম কষ্ট দেয় সেইরকম কষ্টই এই মুহূর্তটি রঘুরাওকে কতবার দিয়েছে। রাও-এর

এই মুহূর্তটির সৌন্দর্য ও বেদনার কথাটি পুরোপুরিই জানা। এইসময়, এই মুহূর্তটিকে মনের মধ্যে আনতে গিয়ে ও একটা গভীর আনন্দের গভীর বেদনাও বোধ করল।

লম্বাড়গোষ্ঠীর একটি মেয়ে চন্দরী। তার বাবার নাম ভাগিয়া। চন্দরী যাযাবরী ও মধুকণ্ঠী, নিজেদের গোষ্ঠীর সাথে দিনকয়েকের জন্য ভগবতী নদীর কিনারে এসে পড়েছে। এই সময়টা তুলোর ফসলের সময়, তাই এই সময়ে দেশমুখরা (গাঁওতিদার) যাযাবরদের তুলোর ফসল তোলার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। চন্দরী এরই জন্য এই সময়ে জমিদারের ক্ষেতে তুলোর ফুল জড় করছিল। নচেৎ সাধারণতঃ সে জঙ্গল থেকে সস্তায় কাঠ জোগাড় করে বিক্রী করে অথবা বাবলা গাছের গঁদ জোগাড় করে ছোট ছোট শহরে হেঁকে বেড়ায়,—গঁদ নাও, গঁদ নাও। রাত্রে তার বাবা ঢোল বাজিয়ে গান গায় আর সে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে নাচে। এই প্রথম লহমার পর আরো দ্বিতীয় কতকগুলো লহমাও এসেছিল। কেননা রাও নওজোয়ান এবং চন্দরী নওজোয়ানী। তারই ফলে বীজও বোনা হবে, ফসলও কাটা যাবে। এইসব লহমাগুলোর ছিল সুগন্ধভরা গান। রাগের তানও ছিল, আবার দেহ আড়াল করে চলে যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। চন্দরী 'একটি স্রোতস্বিনী—একটি প্রসারিত ঢেউ। সে যখন রাও-এর বাগদত্তা হয়ে গেল তখন হোল একজন সুন্দরী নটীও। নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বা অন্য কোনো লোকের সামনে নাচতো না, ভাবী স্বামীর সামনে জঙ্গলে অথবা নাগিওয়ের বাড়ির সামনে ছাড়া। এইসময় সে তাঁতের মোটা ফুলদার ঘাঘরা পরত। তার উপর দেড়-দু ফুট রূপোর গোট দেওয়া, পেটের অর্ধেকটা খোলা, আর পায়ের গোছার উপর পিতলের গয়নায় সাপের ফণা। এই নটীকে দেখে রাওয়ের মনে একখানা পাল্কীর ছবি ভেসে উঠত। সেটি খুব রঙীন আর সুন্দর। দুপাশে লাল রেশমীর তৈরি পর্দা সেটি আজ খালি নেই।

আবার সেই সময়কার কথা মনে পড়ে যখন চন্দরী তুলোর ফুল জড়ো করে নিল, আর ও বেলা প্রায় একটার কাছাকাছি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ভগবতী নদীর দিকে রওনা হল, যেখানে চন্দরীর স্বজাতিরা তাঁবু গেড়েছে। রাস্তায় ওর সাথে রামান্নুর দেখা হতেই সে একটু মুচকি হাসি ছাড়া আর কিছু বললো না। রাও এদিকে অবশ্য বিশেষ নজর দিল না কেননা রামান্নুর হাসিটি একটু বিষাদভরা বলে বোধ হোল। রাস্তায় ওর কাকা রঙ্গড়ুর সাথেও আবার দেখা, সেও একটু হেসে দিল। রাও কিন্তু খুশি, সে বেপরোয়া

এগিয়ে চললো। ও মনে ভাবলো, আমি নিজের জাতের বাইরে ভালবেসেছি বলে বুড়ো কাকা হাসছে, তা হাসুক। রাও মাথা নিচু করে শিউলী ফুলের ঝাড় থেকে বেরিয়ে নাগফণীর ঝাড়ে দুপাশভরা রাস্তাটার উপর দিয়ে উঠলো। রাস্তাটি যাযাবরদের আড্ডার দিকে চলে গেছে। প্রায় আধ মাইলটাক গিয়ে ও যেখানে যাযাবরদের গাধাগুলো চরে বেড়াচ্ছিল সেখানে পৌছলো, কাছেই তাঁবু ফেলা। কোনো কোনো তাঁবু পাটের, আবার কোনোটা তালপাতার তৈরি। পুরুষ মানুষটা চাটায়ের উপর বসে সেটা বুনছে। আবার কোনো কোনো মেয়েছেলে সন্তাবু গাছের ল্যাকপেকে ডাল দিয়ে ঝুড়ি বুনছে। একজন বুড়িমা একলা একলা বসে যৌবনের গান গাইছে, শুনে কতকগুলো যুবতী হাসছে। রাও এইসব দেখতে দেখতে ভাগিয়ার তাঁবুতে এসে পৌছলো। ভাগিয়া একটা উনানের উপর ঘিতে পান আর লবঙ্গ লাগিয়ে দিয়ে মিশিয়ে সেটা গরম করছে।

রাও জিজ্ঞেস করল : এ দিয়ে কি হবে ?

ভাগিয়া চোখ টিপে বলল : এইসব মিশালের ঘি একদম আসলের মতো দেখতে।

'আসল ঘিই বা বেচনা কেন ?'

'আরে আসল ঘি বেচলে কিনবে কে ? এত দামী। তাই নকল ঘিটাকে আসল বলেই চালাচ্ছি।'

'চন্দরী কোথায় ?'

'এই যে এসে যাবে, বসো।'

'কোথায় ?'

'গড়ে গেছে—জমিদারের ছেলে ডেকে পাঠিয়েছে।'

রাও-এর বুকটা ধক্‌ধক্ করে উঠলো, কিছুক্ষণ পরে বলল : জমিদারের ছেলে ডেকেছে কেন ?

'কি জানি ?' ভাগিয়া ঘিতে কাঠের চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, সকালে গেছে, এবারে বোধহয় এসে যাবে, বসো।

রাও মাটিতে বসে পড়ল।

বিকেল গেল, সন্ধ্যেও উত্‌রে গেল। অস্তগত সূর্যের লাল আভাটাও আকাশ থেকে চলে যাচ্ছে, এমনি সময়ে চন্দরী জমিদারের গড় থেকে ফিরে এল। রাও-এর রাগত চেহারাটা দেখে মুহূর্তের জন্য চন্দরী ভয় পায়। শেষে সাহস করে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে বলল : তুমি কখন এলে ?

রাও কোনো জবাব দিল না।

চন্দরী ওর কাছে এসে দাঁড়িয়ে আঁচলটা নিয়ে খেলতে লাগলো। 'নাগকনীর সরবৎ খাবে?' চন্দরী সুর মোলায়েম করে বলে।

'না।'

'তোমার জন্য ঠাণ্ডা তরমুজ তুলে আনবো?'

'না, না', রাগে চেঁচিয়ে উঠলো। 'আমার কিছুই দরকার নেই।'

'কি ব্যাপার চেঁচাচ্ছ কেন?' চন্দরী হয়রান হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'কোথায় গিছলে?'

'প্রতাপ রেড্ডী ডেকেছিল।' চন্দরী বলে।

'ওখানে গেলে কেন?'

'মালিক ডেকেছেন কেন যাব না?' চন্দরী অবাক হয়ে বলে।

'ওখানে কি—কি হোল?'

এতক্ষণ চন্দরী দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বসে পড়ে বড় ক্লান্তস্বরে বলে—'নতুন কিছু না, হামেশাই যা হয়ে থাকে।'

'বেশ্যা', রাগে রাও চিৎকার করে উঠলো।

'আমি বেশ্যা নই।' চমকে উঠে রেগে চন্দরী বলে। 'আমি ওকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, ও আমার সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে কিন্তু কখনো আমার বুকে হাত দিতে পারবে না।'

'বুকে হাত না দেবার মানে।'

'বাচ্চা দুধ খাবে বলে।'

'বাচ্চা দুধ খাওয়ার সময়—' চন্দরী গভীর প্রেমভরা দৃষ্টিতে রাও-এর দিকে তাকালো। রাও চোখদুটো নামিয়ে নিল। রাগে ও ক্ষোভে নিজের মনে মনে ও ভাবল—চন্দরী, বাচ্চা দুধ খায় বলে কি শুধু বুকটাই পবিত্র? যে শিরা বাচ্চাকে দুধ দেয় সেটা কি পবিত্র নয়? যে ঠোঁটে আওয়াজ হয় সেটা কি পবিত্র নয়? যে বাহু আপনার কোলে শিশুকে শোয়ায়? চন্দরী তুমি তো সমগ্র দেহটা নিয়ে পবিত্র হতে পারতে? কেন তুমি এই পবিত্রতাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দিলে?

চন্দরী কোনো জবাব দিল না। কেননা ওদের গোষ্ঠীর কোনো মেয়েমানুষের কাছেই এই জুলুমের জবাব নেই। ব্যাস, চন্দরী চুপ করে কাঁদতে লাগল। রাও পাশে চুপচাপ বসে সেই অশ্রুধারা বয়ে যেতে দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে চন্দরীর চোখের জল শুকিয়ে যায়—আরও কিছুক্ষণ

পরে শুকনো মাটিতে অঙ্কুর কোনো চিহ্নই থাকে না। হঠাৎ রাও উঠে দাঁড়ায়, কেননা আচমকা খেয়াল হোল যে এই অজ্ঞ অঙ্কের মাটিতে বন্যা আনতে পারবে না, এর জন্যে কৃষককে দিতে হবে তার নিজের রক্ত।

সেইমুহূর্তে সে তার সমগ্র প্রেমের বেড়াগুলি ডিঙিয়ে চলে আসে। এই এক মুহূর্তেই তার মনের সমস্ত পুরোনো দেয়ালগুলো পেরিয়ে আসে। এই-মুহূর্তে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতেই একটা নতুন মুহূর্তের হাত ধরে।

সে রাত্রে ও আর ঘরে না ফিরে চলে যায় গাঁয়ের বাইরে। এই রাস্তায় ওকে একবার গোলাম হয়ে যেতে হয়েছিল, আজ ও আর গোলাম নয়, স্বাধীন। আর ওর হাতে একখানা নতুন আয়না। আজ ও একটি রঙীন, মনোহর মিনা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এক নতুন কনের সন্ধানে।

তিন

আজপর্যন্ত যা কিছু হয়েছে রঘু রাও তার কিছু এখান থেকে কিছু ওখান থেকে দেখতে পারে, যেন পুরনো ইতিহাসের—যে ইতিহাস জীবনের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত চলে—হারিয়ে গেছে মাঝখানের কয়েকটি ছত্র। কিন্তু তারপরের ঘটনাগুলোর এক একটা আর আলাদা করে তুলে নিয়ে দেখা যায় না। যদি একটা ধরে টানা যায় তবে আর একটা তার সাথে সাথে আসে উঠে। যেন সবগুলো একটি তারে একইসূত্রে গাঁথা। কোথাও কোথাও খুব জোর আঘাতও ছিল, কোথাও বা ছিল পথ ভুলানো বালুবেলা। কিন্তু এইসব নানা দুঃখকষ্ট ও মুশকিলের মধ্যেও ওর কাছে আর একটি দিক দেখা দিল, যেটি না হলে গত তিন বছরের দুঃখকষ্ট হয়ত বা কাটিয়ে আসতে পারত না।

প্রথম প্রথম তো ও বুঝতেই পারে নি যে, কোথায় যাবে আর করবেই বা কি। জীবন সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা ওর ছিল। ছিল জুলুমের একটা অন্ধ অভিজ্ঞতা, এবং একটা নিরাশ্রয়ী প্রেমের পিপাসা। যেটা সূর্যপেটে তিন-চার মাস বাসন-কোসন মেজেও মেটেনি। যে বেনে বউ-এর ও চাকর ছিল তিনি সারাদিন ওকে খাটিয়ে নিয়ে মাত্র প্রাণ ধারণের মতো সামান্য রুটি দিতেন। এই গাঁয়েই প্রতাপ রেড্ডীর তেজারতি ছিল। কখনো কখনো বেনিয়ার ঘরে কোনো অতিথি এলে সে রাতে রাওকে নিরম্বু উপবাসী শুয়ে পড়তে হোত। ওর গাঁয়েও ওকে কয়েকবার উপবাসী শুয়ে থাকতে হয়েছে। কথায় কথায় রাও টের পেয়ে গেল যে, বেনিয়ার গাঁয়ে বহু জমি আছে। এবং আরও অনেক জমি সে কেনবার ব্যবস্থা করেছে। বাসন-কোসন মাজতে মাজতেই রাও তার নিজের চোখের সামনেই একটা ছোটখাট জগন্নাথ রেড্ডী তৈরি হতে দেখল। এটা সত্য যে, বেনের বাড়িটা খুব বড় আর বাড়ির বাইরে চমৎকার গড়ও নেই। কিন্তু ও নিজের খিদের, একজন বাসন-কোসন মাজা চাকরের খিদের সাথে গাঁয়ের একজন বেগারীর খিদের তুলনাটা তো করতে

পারে। নিজের শ্রম ও কষ্টের সাথে বেগারীর কষ্ট ও শ্রমের তুলনাটা তো করতে পারে। ক্রমশঃ বুঝতে পারলো যে, বেগার কেবল গাঁয়েই নেই, শহরেও আছে, গাঁয়েই শুধু রেড্ডী নেই, শহরেও আছে। রেড্ডীকে ভগবান সৃষ্টি করে পাঠান না। রাতের আঁধারে সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে রেড্ডী তৈরি হয়। কথাটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাও-এর সেই সময়ই হয়েছে, যখন বেনে ওকে দু-তিনবার চোরাবাজারের জিনিষ এধার-ওধার নিয়ে যাওয়ার কাজে নিযুক্ত করেছিল। প্রত্যেকবারই বেনের থলিটা ছিল ভরা আর ওর পেট খালি। নিজের খিদের আর থলির তুলনাটা যে ও করবে না সেটা ছিল অসম্ভব। একটি কাজ রয়েছে ওর সামনে, রয়েছে কি ভয়ানক সর্বনেশে খেলা। জগন্নাথ রেড্ডীর ঘরের ভিতর যাওয়ার সুযোগ ওর কখনো ঘটে নি। কিন্তু আজ ও রয়েছে শত্রুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত। এখানে ও দিনরাত বেনে আর তার বউয়ের সলাপরামর্শ করতে শোনে। এইসব পরামর্শে হামেশাই টাকা ও জমির কথা হয়। কিন্তু ওর খিদের কথাটা হয় না কোনদিনই।

চোরাকারবার সম্পর্কে দু'একবার মনে হয়েছিলো যে, ও এই সর্বনেশে খেলাটা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু কেমন করে? গেঁয়ো লোকের স্বভাবের অভিজ্ঞতাটা ওর ছিল। গাঁয়ের পুলিশ ও পয়সাওয়ালা লোকের মেলামেশার কথাটাও ওর স্মরণ ছিল। এ অভিজ্ঞতা ওর খবরের কাগজ পড়ে হয় নি, নিজের জীবনের প্রতিটি লহমায় পড়েছে, চোখে দেখেছে। তারই ফলে সূর্যপেটে চারমাস থেকেও ওর মুহূর্তের জন্যেও মনে হয় নি যে, এ ব্যাপারে ও পুলিশের কাছে যেতে পারে। লাখবার বললেও এটা ওর মগজে ঢোকে না যে, এসব ব্যাপারে পুলিশ কিছু করতে পারে। তবুও কোনো লোক ওকে এসব করতে বললে হয়ত বা চুপ করে থাকবে, নয়ত ও একটু তিতো হাসিতে জবাব দেবে।

ওর যে গলিতে বাসা সেই গলিতেই আরো কয়েকজন বাসনমাজার চাকর ছিল,—শহরের বেগারী। ওরই মতো বহু বেগারী এসেছে গাঁ থেকে—বিভিন্ন জায়গা—হিন্দুস্থানের প্রতিটি প্রান্ত থেকে। এদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের এক ধরনের সমবেদনাও ছিল। এরা সব মালিকের অনুপস্থিতিতে হরদম তাদের খুব গালাগালি দিত। গাঁয়ের বেগারীরা এটা একদম করে না। কিন্তু রঘু রাও-এর এসব বিষয়ে কোনো প্রত্যয় হোত না। গালাগালিতে হৃদয়ের জ্বালা তো যায় কিন্তু পেটের খিদে দূর হয় না।

একদিন রঘু রাও তার প্রতিবেশী চাকর ভেঙ্কটকে একথা বলায় ভেঙ্কট জোরে হেসে বলল, রাও তুই তো একদম আহম্মক। এসব কথাবার্তায় কিছু হবে না। খিদে দূর করার রাস্তাটা হল, মালিক তোকে কাটে তো তুইও মালিককে কাট। সব্জিতে ভাজি, ডালে ডলাই-মলাই অর পানে সুপারির প্রয়োজন। যেমন রোগী তেমনি তার দাওয়াই হওয়া চাই। আর কোনকিছু যদি না হয় তো মওকা দেখে একদিন বেনে গিন্নীর গয়না নিয়ে সরে পড় অথবা বেনে গিন্নীকে নিয়েই ভেগে যা না। তুই তো জোয়ান, সুশ্রীও আছিস। গাঁ থেকে নতুন এসেছিস। শরীরে এখনো তোর রক্তও আছে।

কথাটা বলে ভেঙ্কট জোরে হেসে রঘুর উরুতে থাপ্পড় মারলো।

ভেঙ্কট গলির মধ্যে চাকরদের সর্দার। ও সবঘাটের জল খেয়ে এসেছে। হরেক জায়গা থেকে চুরি করে পালিয়ে এসেছে, জীবনে বিশবার নাম বদলেছে। সে আরো বিশবার নাম বদলানোর জন্য তৈরি। আশে-পাশের প্রতিবেশী এমনকি অন্য মহল্লার চাকরদের মধ্যেও ছিঁচকে চোর ছিল, ভেঙ্কট তাদের কাছ থেকেও ওর বখরা নিত। আবার বহু চাকর একসঙ্গে মদ খেত অথবা চরসে দম মারতো নিজের মনিবকে চড়া কথা শুনিয়ে, কিছুক্ষণ পরেই আবার মনিবের ঘরে ভিজে বেড়াল হয়ে বাসন মাজতো। ভেঙ্কট বারকয়েক রঘুকে নিজের বাসায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু রঘু কেন যেন তফাতেই রয়ে গেছে। ও জানতো বেগারীদের কোন কথায় ওর অপছন্দ। রঘু রাও-এর মনে হয় যে, ছোট পশুপাখীর খুপরির মতো ঘরখানি একটি পেষণচক্র, যেটা গরীব মানুষকে ধীরে ধীরে পাপের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এদের দেখে দরগাইয়া ও ভিমাইয়ার কথা মনে পড়ে যায়। বাবার কাছে শুনেছে যে, ওদের মতোই এদেরও এক সময়ে জমি-জমা ছিল। পরে ওরা ক্ষেত মজুর হয়। ক্ষেত মজুর থেকে বেগার, বেগারের থেকে জমিদার ও দেশমুখদের গুণ্ডায় পরিণত হয়। ওর চোখের উপরই চরসে দম দেওয়ার মধ্যে মদের বোতলে আর পানের কোকেনে দরগাইয়া ভিমাইয়ার মতো ওদের নির্দয় গুণ্ডা হতেও দেখেছে। এরা ওরই মতো মানুষ—ওর সামনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। রূপান্তরিত হয়ে আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছে। গাঁয়ে যে সব কথা জানতো এখানে এসে সেগুলিও ভুলে বসেছে, রঘু রাও-এর একটা ভয়ানক দিশেহারা ভাব ; ক্রোধ আর একটা পবিত্র ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এগুলি দিয়েই সে ঘটনার এই ক্ষতিকর ধারাটি দিতে পারে বদলে।

রঘু কৃষকের বিচারবুদ্ধি নিয়ে কেবল নিজেকেই বাঁচাতে চাইলো। অত্যন্ত

বহু ও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ও বেনিয়ার কাজ করে দিত। এত শ্রম সে গাঁয়েও কোনদিন করে নি। তবুও এতে কোনো ফলোদয় হোল না। কোনদিন দান হিসেবে ওর কিছু বেশি রুটি জুটতো। বেনিয়ার স্ত্রীর একটা হাসিখুশী খুব ভাল ছেলে ছিল। দুচারদিন ভালই চলে। তারপর আবার সেই খিদে, সেই উচ্ছিষ্ট রুটির ছোট টুকরো, একদিন ছোট একটা থালা হারিয়ে গেল। রাও-এর জুটলো চুরির অপবাদ। বেনিয়ার স্ত্রী খুব মারলো, বেনিয়া পুলিশে দেবে বলে খুব শাসালো। বেনিয়ার থানায় যাবার আগেই থালাখানা পাওয়া গেল অন্য একজন লোকের ঘরে একখানা খাটিয়ার নিচে, বেনে ও বেনে-গৃহিনী দুজনেই চুপ হয়ে গেল, কিন্তু মাফ চাইলো না। মালিক একজন বেগারীর কাছে ক্ষমা চাইবে, সেটা কি কখনো সম্ভব? রঘু রাও-এর মনে পড়ল কোনো না কোনো প্রকারের সামান্য ভুলত্রুটিতে ওকে দশবার মাফ চাইতে হয়েছে, কিন্তু এ-বেলা ও যে চাকর।

যেদিন রঘু রাও-এর গায়ে চুরির কলঙ্ক ছিটলো সেদিন ও ভয়ানক আনমনা। ভেঙ্কট ওকে ভোলানোর জন্য অশ্লীল সান্ত্বনার কথা অনেক শোনালো। তবু ওর মন তাতে শান্ত নয়। সে ওকে চরসে দম দিয়ে জীবনের দুঃখকষ্ট ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিল। রাও সেটিও মানলো না। কিন্তু রাও-এর কাজকর্ম সারার শেষে ভেঙ্কট তাকে টেনে-হিচড়ে স্ত্রীলোকেরা যেখানে তাদের দেহ বিক্রী করে সেখানে নিয়ে গেল। রাও আজ পর্যন্ত এদিক মাড়ায় নি, এইজন্যে প্রথমে বুঝতে পারে নি, ভেঙ্কট ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্কট শুধু এইকথাই বলেছিল যে, আজ ওকে সে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে গেলে ও জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে যাবে। রাও-এর বার বার তাগিদ সত্বেও ভেঙ্কট ওকে বলে নি। অবশেষে রাও তার সামনে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেল। ঠিক জায়গায় পৌঁছে ভেঙ্কট ধাক্কা মেরে রাওকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে রইলো। এখানে রঘু দেখল ধোঁয়ায় ভরা কামরাগুলোর হলদে রঙের তক্তপোষ—খুব ছোট ঘর। গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একটি স্ত্রীলোক ঈষৎ হাসার চেষ্টা করছে। রাও মুখ ফিরিয়ে ভেঙ্কটকে জিজ্ঞাসা করল—'এটা কে?' ভেঙ্কট ওর হাতের তালুতে আটআনা পয়সা দিয়ে বলল, 'যাও বেটা আরাম কর।'

কথাটি বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কামরায় সেই স্ত্রীলোকটি আর রঘু একলা।

স্ত্রীলোকটি তক্তপোষের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'বসে পড়।'

রাও কিন্তু অনেকক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো এবং স্ত্রীলোকটিকে দেখতে লাগলো ।

স্ত্রীলোকটি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি, বসে যাও ।' রাও সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার বুকে হাত রাখবো ?'

স্ত্রীলোকটির কাছে প্রশ্নটি বড়ই আশ্চর্যজনক । তবুও সে বললো, 'হ্যাঁ, তুমি পয়সা দিয়েছো । শুধু বুকে কেন আমার সারা শরীরেই হাত দিতে পারো ।'

ক্ষণিকের জন্য রাও-এর দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, কামরা থেকে বেরিয়ে এলো । স্ত্রীলোকটি ওকে ডাকতে লাগল । রাও গলিতে বেরিয়ে পড়লো । ভেঙ্কটও ওকে ডাকলো, কিন্তু রাও প্রথমে একটু একটু করে, শেষে জোরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল । দৌড়তে দৌড়তে ও মনে করল সূর্যপেট থেকে চলে যাবে । কেননা ওর গাঁয়ের মেয়েটি তো তবু কম, বুকখানা অন্ততঃ বাঁচিয়েছিল । আর এখানে সূর্যপেটে, স্ত্রীলোকেরা গোটা দেহটাই বিক্রী করে দিয়েছে । ওর মনে হোল, আজকের পর সূর্যপেটেও ও আর থাকতে পারবে না ।

রাও ফাঁসী সেলের অন্ধকারে নিজের আদর্শানুরাগের প্রতি একটু হাসলো । আদর্শের প্রতি এই অনুরাগ ওকে সূর্যপেট থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল । শ্রীপুরম থেকে ও এসেছিল সূর্যপেটে । সূর্যপেট থেকে চলে গেল হায়দরাবাদ । এখানে এসে ও রিক্সা টানা শুরু করলো । বাহু ছিল মজবুত, বুকও দৃঢ় । পায়ের পেশীগুলি শক্ত, বিনা আয়াসে চড়াইয়ে উঠতেও পারতো । আবার ঠিক তেমনিই পারতো উৎরাইয়ে নামতে । নতুন নতুন কংক্রিটের রাস্তা ওর ভাল লাগলো, ভাল লাগলো বিজলী আলোর রোশনাই, আর রিক্সার ঘন্টি । রাত্রে ভরপেট খাবার মিলতো । মনে হোল যেন বাঞ্ছিত দ্রব্যের সন্ধান ও পেয়েছে । রিক্সার মালিকও ওকে দুটি উর্দি তৈরি করিয়ে দিল । সবকিছু ভুলে গিয়ে, খুব মজা করে হায়দরাবাদের সড়কের উপর পাঁচ ছমাস ও তেজী কুকুরের মতো দৌড়ে বেড়াতে লাগল । ও যে একটা মানুষ যাকে ঘোড়ার মতো জুতে দেওয়া হয়েছে, সেটা ভুলে গেল । একথা ভুলে গেল যে, কিছু লোক রিক্সা চড়ে আর কিছু লোক সর্বদাই রিক্সা চালায় । কি মতলবে ও এসেছিল সেকথাও ভুলে গেল । দুখানা কাপড়, দুবেলা খাওয়া আর কিছু টাকা ওর চোখে একটা ঘূর্ণীর রঙের আবরণ এঁটে দিল, আর যেদিন বাবা ভেরাইয়াকে কুড়িটা টাকা পাঠিয়েছিল, সেদিন তো ভাবল যে,

ওর মতো সৌভাগ্যবান সারা হায়দরাবাদে আর কেউ নেই। বিড়িটা বেশ ভাল, সিগারেট আরো ভাল আর সবচেয়ে ভাল গোস্ত।

পাঁচ ছমাস এইভাবে কাটার পর ও অসুখে পড়ে। ভেবেছিল যে অসুখটা সামান্যই। কিন্তু তা নয়, প্রথমদিকে একদিন চড়াইয়ে উঠতে গিয়ে ওর মাথা ঘুরে গেল। অতিকষ্টে সেটাও সামলে নিল। পরে একদিন কাশি, সামান্য কাশি লেগেই রইলো এবং সাধারণ জ্বর। পরে হঠাৎ একমাস অসুখে পড়ে রইলো। এবার রিক্সার মালিক ওর খুব শুশ্রূষা করেছিল। কেননা ও-ই হচ্ছে মালিকের সবচেয়ে ভাল রিক্সা টানিয়ে। কিছু পয়সা রঘু সঞ্চয় করে রেখেছিল, এই অসুখে সেটা ওর কাজে লেগে গেল। এইভাবে মাস দুয়েক পরেই সুস্থ হয়ে উঠলো। কিন্তু শরীর এখনো সারে নি, তবু আবার আস্তে আস্তে রিক্সা টানতে লাগলো, কিন্তু ধীরে ধীরে অল্পঅল্প কাশি বাড়ছেই। ডাক্তার ওকে দুমাস সম্পূর্ণ বিশ্রামের বিধান দিলেন, কিন্তু বেকাররা যদি কাজ না করে তবে খাবে কোথা থেকে? তাই রিক্সা চালানো দরকার। সুতরাং দম ভরে আসতে লাগলো আর মাথায়, সারা শরীরে ঘাম। শিরা-উপশিরা রক্তের চাপে দপ্ দপ্ করে আর আঁধার কালো রঙের কাশি বেরুতে লাগলো, কিন্তু রিক্সা তবু চালাতেই হবে, আবার ফিরে এলো।

রঘু রাও চিন্তা করতে করতে থেমে গেল। মুহূর্তের জন্য সেইসব লোকের কথা মনে পড়লো, যারা ওর রিক্সায় চড়েছিল, এক আনা নিয়ে ওর সাথে ঝগড়া করেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরা—যারা চায় রিক্সাটা জোরে চলুক; গুণ্ডা—যে রাতের আঁধারে ছোরা নিয়ে ঘোরে; প্রেমিক—যে সিনেমার পর্দা ছিঁড়ে ফেলে. আর রিক্সার পর্দা টেনে দিয়ে পর্দানশীন মেয়েদের সঙ্গে জবরদস্তি প্রেম করে। যখন রিক্সা চালাতে চালাতে ও কাশে তখন ওরা কদর্য গালি দেয়। কিম্বা রিক্সা থেকে নেমে গিয়ে পয়সা না দিয়েই আরেকটি রিক্সার সওয়ার হয়। মৌলভী—যিনি রিক্সার চারদিক চাদর দিয়ে ঘিরে ব্যবহার করেন; খদ্দরধারী—যিনি রিক্সাকে পিকদানের মতো ব্যবহার করেন; বেনিয়া—রিক্সাকে মালগাড়ী মনে করেন। স্ত্রীলোক যাঁরা রিক্সাকে শিশুদের অনাথাশ্রম মনে করেন;—হরেক রকমের মজার লোকের সেবা করতে হয়েছে। গাঁয়ে রাও দুঃখ পেতে শিখেছিল, সহরে সে দুঃখ পেয়ে মুচকি হাসতে শিখেছে। অন্যের উপর মুচকি হাসতে আর নিজের উপর হাসতে শিখেছে।

রঘু রাও এই সমস্ত জনতার ভীড় একনজর দেখে তাদের মধ্য থেকে একটি লোককে বেছে নিল। একদিন রাত একটার সময় লোকটি আবদুল আলি রোড থেকে ওর রিক্সায় সওয়ার হয়েছিল। তাঁর হাতে দুখানি বই। স্বরটিও বড়ই মধুর। যেভাবে তিনি রিক্সাওয়ালাকে নিজের কাছে ডাকলেন, তাতে না আছে অহঙ্কার না ঘনিষ্টতার ভাব। ভাড়াটিও তিনি নিজে বলে দিলেন, বেশিও নয়, কমও নয়—ন্যায্য ভাড়া। তাই এ কথাতেও কোনো বিরোধ হল না। হরদম লোকে রিক্সাওয়ালার কাছে আবোল-তাবোল প্রশ্ন করে। আর এটা করতে গিয়ে ভাবে না যে রিক্সা চালাতে হলে শ্বাস নেওয়া এত কম হয় যে কথা বলা আর রিক্সা চালানো—দুটো একসাথে হতে পারে না। হয় কথা বলতে পারে—নয় রিক্সা চালাতে পারে। এদিক দিয়েও লোকটি ভাল। অর্ধেক রাস্তা এইভাবে নির্বাক কাটলো।

এরপর জিয়াই রোডের মোড়ে এসে লোকটি আস্তে আস্তে বললেন, এখান থেকে আখতার রোডের দিকে যেতে হবে। চড়াইটা লম্বা। রাও-এর দম ফুরিয়ে গেল। আবার ঘুরে ফিরে সেই কাশি। লোকটি অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন, 'রিক্সা থামাও' !

রাও বললে, 'না সাহেব ভয় পাবেন না। এখুনি ভাল হয়ে যাব। আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

লোকটি নরম অথচ কড়া সুরে বললেন, 'রিক্সা থামাও।'

রাও রিক্সা থামালো। মনে হোল এইবার লোকটি ওকে বাতিল করে দেবেন। হয়ত বা দুচারটে গালাগালি দিয়ে চলে যাবেন, ওর ভাড়াটিও মার যাবে। লোকটি কিন্তু এসব কিছুই করলেন না। তিনি রাও-এর সাথে সাথে চলতে লাগলেন, 'চড়াইটা তুমি খালি রিক্সা নিয়ে চল। আমি এগিয়ে গিয়ে আবার তোমার রিক্সায় চড়বো।'

রাও চলতে চলতে সকৃতজ্ঞভাবে লোকটিকে দেখলো। লোকটার কালো চেহারায় দুটো বড় বড় দীপ্তিভরা চোখে একটা অদ্ভুত সমবেদনার ছাপ আঁকা রয়েছে। সমবেদনা, জ্ঞান ও ভব্যতা। একটা অদ্ভুতরকমের নৈকট্য ও দূরত্ব।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন থেকে কাশি হয়েছে ?'

'মাসখানেক।'

'থাক কোথায় ?'

'গোবিন্দরামের বাড়ি।'

'ইউনিয়নের মেম্বার হয়েছো ?'

'কি ?' কথাটা রাও বুঝতে পারলো না।

লোকটি কয়েক মুহূর্ত রাও-এর সাথে চললো। পরে আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত রেখে বলল, 'তুমি যেমন এই রিক্সা চালাচ্ছো, তেমনি এই সহরের অন্য রিক্সাওয়ালারাও আছে। সবারই দুঃখ একরকমের। এরই জন্য সবার চিকিৎসা একই রকমের হতে পারে। তাই রিক্সাওয়ালারা নিজেদের জন্য একটা ইউনিয়ন তৈরি করেছে, যেখানে সব রিক্সাওয়ালা মিলে একটা জায়গায় বসে।'

রাও সাথীটিকে খুব সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। ওর মনে সূর্যশেটের চাকরদের আড্ডার কথাটা ঘুরে এলো। ওখানে সবাই এসে জটলা করতো। ও রাগ করে লোকটার হাতখানা তার গা থেকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'না সাহেব, আমি কোনো আড্ডাখানার মেম্বার নই। মেম্বার হতেও চাইনে।'

লোকটা আরো কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে সাথে চললো, তারপর আবার এইসব প্রশ্ন শুরু করল, রঘু রাও-এর নাম, কোথা থেকে এসেছে, রিক্সা চালাবার সময় কেমন করে শ্বাস কষ্ট হয়, উৎরাইয়ে রিক্সা কেমন করে চালাতে হয়, সস্তা খোরাক কোথায় মেলে, সস্তা বাড়িই বা কোথায়। যে মালিক খোরাক-পোষাক আর বাড়ি দেয়, রিক্সার আয় থেকে কত অংশ তার জন্য সে নেয়—বড়ই কাজের কথা। রাও বেওকুফের মতো কথাগুলো শুনতে লাগলো। পথে চলতে চলতে কখন যে চড়াইটা পেরিয়ে গেছে তা সে টেরই পেল না। কত রাস্তার মোড়, গলি, বাজার পিছনে চলে গেল। ওরা দুজন কথাবার্তা বলতে বলতে লোকটির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এই সময়ের মধ্যে লোকটি এক মিনিটের জন্যও আর চড়েনি। বাড়িতে পৌঁছে লোকটি ওকে পয়সা দিয়ে বলল, 'এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও।'

রাও অস্বীকার করলো।

'না, না, এস, এখন ঠাণ্ডার সময়। চা খেলে শরীরটা গরম আর চাঙ্গা হয়ে উঠবে।' এই না বলে লোকটি রাও-এর হাত ধরে তার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরখানা খুব ছোট, কিন্তু ভারী পরিষ্কার ঝকঝকে, তকতকে। দুটো কামরা, একটায় ও ঢুকেছে আর দ্বিতীয়টি অন্দরে। দুই ঘরের মাঝখানে একটা ফুলদার পর্দা। বাইরের ঘরটায় তিনখানা চেয়ার। চেয়ারগুলোর গদি আঁটা। একখানা লম্বা বেঞ্চ, তার উপর একটা নীল গদি। মেঝের পাতা

একখানি সবুজ সতরঞ্চি। চারধারে কাঠের তাকে রয়েছে বই। এই পর্যন্ত দেখতে দেখতে ও অন্দর থেকে ক্ষীণাঙ্গী-শ্যামাঙ্গী স্ত্রীলোককে ফুলদার পর্দা সরিয়ে দিয়ে এঘরে আসতে দেখলো। তার সাথে একটি ছোট মেয়েও দৌড়তে দৌড়তে এলো, ঘরে এসেই যে লোকটি রাওকে এখানে এনেছিল তার পায়ের কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালো।

লোকটি মুচকি হেসে রঘুকে বললো, 'আমার নাম মকবুল, ইনি আমার স্ত্রী আর আমার কন্যা আমিনা।' তারপর আমিনাকে কোলে নিয়ে বলল, 'ইনি আমার সাথী রঘু রাও, এঁকে সেলাম কর বেটি, ওঁর কোলে যাও।'

আমিনা তার সুকোমল বাহুদুটো দিল রাওয়ের দিকে বাড়িয়ে। রাও খুব আশ্চর্য ও অত্যন্ত স্নেহে আমিনাকে কোলে তুলে নিল। আমিনা ওর বাহুর ভিতর এসে বলল, 'সাথী লাল সালাম।'

আমিনা খিল খিল করে হেসে উঠলো, মকবুল হাসলো, মকবুলের স্ত্রীও একটু হাসলো। গদি আঁটা একটা চেয়ারে বসে স্ত্রীকে বললে, 'সাথীটি আজ এখানেই খাবে।'

রাও আবার অবাক হয়ে মকবুলের দিকে তাকালো। কিন্তু এরপর আর কিছু বলতে পারলো না।

মেঝের ছোট সতরঞ্চির উপর, চীনামাটির পরিষ্কার থালায় সবাই মিলে খাওয়া শেষ করলো। আমিনা রাও-এর কোলে, কোলে বসেই সে তার কাছে খেতে চাইলো। যেমনটি রাও ছেলেবেলায় তার বাবার কাছে খেতে চাইতো। রাওয়ের এই মধুমাখা কথাগুলি ভারী ভাল লাগলো। মকবুলের স্ত্রী সুরাইয়ার বারবার রাও-এর প্লেটে ছোট ছোট মাংসের টুকরো দেওয়া খুব ভাল লাগছিলো। রাও চুপচাপ খেতে লাগলো, 'সাথী কাকে বলে,' 'লাল সেলামের অর্থ কি,' আর সবচেয়ে এই প্রীতি, এই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব সহকর্মীর স্নেহের টান ইত্যাদি—নানা কথাবার্তায় এগুলির অর্থ জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল।

খাওয়ার শেষে সুরাইয়া চাদরখানা সরিয়ে রাখলো, আর ওর জন্য গরম এক কাপ চা নিয়ে এলো। চা খেয়ে রাও মকবুলের দিকে তাকালো, কিছু বলতে যাচ্ছিলো। মকবুল বলল, যতদিন তোমার কাশিটা থাকবে ততদিন রাতে কাজ করা উচিত নয়। রাও চুপ।

মকবুল বলল, 'আমাদের ইউনিয়নের একজন ডাক্তার আছেন। তুমি তাঁর কাছে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে পার।'

রাও নিশ্চুপ।

মকবুল বলল, 'এত ঠাণ্ডায় গিয়ে তুমি কি করবে ? এখানেই শুয়ে থাক ।'

হঠাৎ রাও জিজ্ঞাসা করল, 'সাথী কথাটার মানে কি ?'

মকবুল আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে সুরাইয়াকে বলল, 'সুরাইয়া, সাথী আজ এখানেই শোবে ।'

সুরাইয়া অন্দর থেকে একটা বিছানা এনে সতরঞ্চির উপর বিছিয়ে দিল। মকবুল ব্যাগ থেকে একখানা বই বেছে নিয়ে রাও-এর পাশে এসে বসলো। দুজনে লেপ টেনে নিল। টেবিল ল্যাম্পের ছায়ামেশা আলোয় মকবুল বইখানা খুললো। রাও অযাচিতভাবে বইখানার মসৃণ পাতায় হাত দিতেই মকবুল বইখানা ওর সামনে এগিয়ে দিল।

রাও কি করবে ভেবে না পেয়ে বইখানার মসৃণ পাতগুলোর উপর হাত বুলোতে লাগলো, অক্ষরগুলো তো ও পড়তে পারে না। তবে হ্যাঁ, কাগজের মসৃণতাটা রেশমের মসৃণতার মতোই। ও ধীরে ধীরে বইখানা মকবুলকে ফিরিয়ে দিল।

মকবুল বইখানা খুললো। একটা পাতায় পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা। প্রথমে নিজের দেশের উপর আঙুল রেখে বলল, এই হিন্দুস্থান আমাদের দেশ। তারপর উপরে উত্তরদিকে একটা আঙুল রেখে 'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এই দেশটাও আমাদের দেশের মতোই বেগারদের দেশ ছিল···'।

চার

রাত গভীর, গল্পটাও ছিল বড়। কিন্তু এই রাতের একেকটি গল্প ও গল্পের একেকটি কথা রাও এর কাছে খুব মূল্যবান। ওর মনে হোল যেন ও চন্দরীর পবিত্র বুকে বসন্তের যে সৌন্দর্য দেখেছিল তার ঝিলিক এখানেও দেখা যাচ্ছে। কথাগুলির মধ্যে ওর নিজের বুকে বহুকালের অতৃপ্ত যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটি ফলবতী হওয়া এখানে অসম্ভব। গড়ের যে বড় বড় খিলানে ওকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল বেপারীদের শক্তি তার চেয়েও বড় বড় খিলান ভেঙে-চুরে দিয়েছে।

কথাগুলো মকবুলের অন্তর থেকে আসা, রঘু রাওয়ের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করছিল। এর মধ্যে তাকে রোধ করতে পারে এমন কোনো শক্তি ছিল না। রাও দিগ্‌দর্শন পেয়েছে, রাস্তাও পেয়েছে। আগে যার অর্থ বুঝতো না, এখন তার মানে খুঁজে পেয়েছে। যেখানে ছিল একটা অন্ধ অভিজ্ঞতা সেখানে এখন আলোর লহর ছুটে চলেছে। যেখানে নদীর কিনারা পাচ্ছিল না সেখানে সে পেল শক্ত মাটি, রাও খুব ভাল করেই সে মাটির উপর পা রাখলো। মনে মনে বলল, আমি জোয়ান আর যা আমি শুনছি তাও নতুন। তাই বীজ বোনাও হবে, ফসলও পাওয়া যাবে।

রাও আজ জানেনা সেদিন সে কতক্ষণ, কত রাত জেগেছিল, আর কখনই বা শুয়ে পড়ল। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, ও আর মকবুল লেপের মধ্যে বসেছিল। ও শুনছিল আর মকবুল শোনাচ্ছিল। কাছেই মেঝেতে শুয়েছিল সুরাইয়া। কচি আমিনার পাতলা নিঃশ্বাস পড়ছিল। ওর কোমল হাতখানা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে টেবিল ল্যাম্পের সাদা সাদা আলোর শিখা দেয়ালের ছায়ায় কাঁপছিল। এ ছাড়া কখন যে ও শুয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলে দেখলো যে, তার একখানা পা লেপের বাইরে বেরিয়ে গেছে আর সুরাইয়া লেপটি তার পায়ের উপর টেনে দিচ্ছে। লেপটি মুড়ে দিতে

গিয়ে সুরাইয়ার আঙ্গুলগুলো ওর পায়ে ঠেকে গেল। যেন কোনো এক সুন্দর অনুভূতিকে এই আঙ্গুলগুলো ছুঁয়ে দিয়ে গেল। ওর চোখ জলে ছলছলিয়ে উঠলো, সেই ছলছল চোখে সুরাইয়াকে ওর বিছানা থেকে সরে মকবুলের লেপ আর তার মেয়ের বিছানা ঠিক করে দিতে দেখলো। শেষে একটা গভীর পরিতৃপ্তির শ্বাস নিয়ে আমিনার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে তাকে শুয়ে পড়তে দেখলো। রঘু রাও-এর অশ্রু উছলে উঠলেও কিন্তু এ অশ্রু সে মুছলো না। কেননা এটা দুঃখের অশ্রু নয়, আনন্দের। ও আজ নিজেরই ঘরে এসেছে।

পাঁচ

রাও কয়েক মুহূর্তের জন্য মকবুল আর তার ঘরের ছবিটার উপর মনোনিবেশ করল। তারপর কি একটা—এই চিন্তা পরম্পরায় ছেদ টেনে দিল। প্রথমে লোহার শিকলের ঝনঝন আওয়াজ পরে দরজা খোলার শব্দ। কিন্তু রাও নিজের জায়গা থেকে নড়লো না—নড়তে সক্ষমও ছিলনা। তারপর মেঝেয় ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন ওয়ার্ডার এসে ওর বাহুর শিকল খুলে দিল। জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ওকে দাঁড়াতে বললেন। রাও আস্তে আস্তে উঠলো, মুহূর্তের জন্য ওঠার আনন্দের-লহর ওর শিরা-উপশিরায় খেলে গেল। পর-মুহূর্তে ডাণ্ডা-বেড়ীতে ওর হাঁটুর ঠোকর লাগল। ফলে হাঁটুতে ডাণ্ডাবেড়ী খানিকটা ফুটে গিয়ে ব্যাথাটা বাড়িয়ে দিল। তথাপি সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

সুপারিনটেনডেন্টের হাতে একখানা ভাঁজপড়া, ময়লা কাগজ। তাঁর হাত কাঁপছে। রাও দেখলো যে, হুকুমনামাটা পড়ার সময় তাঁর নানাধরনের ভাবনা চিন্তাজনিত লজ্জাভরা চেহারার উপর ঘাম দেখা দিয়েছে। এই হুকুমনামায় রাও-এর আবেদন না-মঞ্জুর করা হয়েছে, এবং মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। কাল সকাল সাতটায় ওর ফাঁসী। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব রুমাল দিয়ে ঘামটা মুছে নিয়ে কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার কিছু বলার আছে?’ উত্তরে রাও একটু মুচকি হাসলমাত্র।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সুপারিনটেনডেন্ট রাও-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরকম কয়েদীর সন্ধান তিনি আর কখনো পান নি। তিরিশ বছরের দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি অজস্র কয়েদী দেখেছেন। বড় বড় দুর্দান্ত ডাকাত, যাদের ফাঁসীর কোনো ভয় ছিল না। কিন্তু তারাও ফাঁসীর হুকুম শুনে সরকারকে পাঁচটা গালাগালি শুনিয়েছে—অনেকে কেঁদেছে—অনেকের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, অনেকে বেহুঁশ হয়ে গেছে। পাগলের মতো ছুটে কাঠ খেতে গিয়েছে অনেকে। অনেকে হাত জোড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

জানিয়েছে। কিন্তু ফাঁসীর হুকুম শুনে একটু মুচকি হাসে, এরকম কয়েদী তিনি কখনো দেখেননি। জেল সুপার ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েদীকে দেখতে লাগলেন, হয়তো বা এই মুচকি হাসার মধ্যে কোনো ভয়, কোনো আশঙ্কা, কোনো গোপন দুর্বলতার প্রকাশ দেখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এ কাজের উপযুক্ত তিনি ছিলেন না। সারাটা জীবন তাঁর অপরাধীদের চেহারার অর্থ বুঝতেই কেটে গেছে। একজন 'মানুষের' চেহারার অর্থ তিনি বুঝবেন কি করে ?

সুপার সাহেব মনে মনে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে, কিছুটা রাগ করে দ্রুত পায়ে ফাঁসী সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর চলে যাওয়ার পর ওয়ার্ডার দুজন অনেকক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলো। শেষে ওদের মধ্যে একজন ওয়ার্ডার যাকে বেশি বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল সে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমাকে বেঁধে রাখতে আমার উপর হুকুম আছে। আমি কিন্তু তোমায় বেঁধে রাখবো না। তোমার হাত বাঁধবো না—তুমি কুঠুরীর মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পার।'

রাও বলল, 'তোমার চাকরী যদি যায় তো আমাকে বেঁধে রাখো।'

'না, আমাদের কোনো ভাবনা নেই।'

রঘু রাও চুপ করে থাকলো।

তারপর বুড়ো ওয়ার্ডারটি এগিয়ে এসে চুপি চুপি বলল, 'তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে ? কোনো জিনিষ ? মিঠাই বা শরবৎ ? আমাকে বল আমি আনিয়ে দিচ্ছি।'

'কিছুই আমার দরকার নেই। শুধু বল এখন রাত কটা।'

বুড়ো ওয়ার্ডার বাইরে গিয়ে বারান্দায় ঘড়িটা দেখে বলল, 'এখন পাঁচটা—এখনো গোটা রাত পড়ে আছে।'

রাও মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ওয়ার্ডার দুজন মাথা নিচু করে চলে গেল। আবার শিকলের শব্দ, ফাঁসী সেল বন্ধ হয়ে গেল। লোহার তালা লাগানোর শব্দ এল—যেন কোনো গভীর কুয়ায় একটা ভারি পাথর পড়ে গেছে। তারপর গভীর নিস্তব্ধতা, নিরঙ্কুশ নিস্তব্ধতা।

রাও হাঁটুর ক্ষতটায় যাতে আঘাত না লাগে সেইজন্য পা ফাঁক করে সেলের মধ্যে আস্তে আস্তে চলার চেষ্টা করল। শুধু চার পা মাত্র চলতে পারে—তার পরেই দেয়াল। চারটি দেয়ালের মধ্যে মাত্র চার পা-এর

দূরত্ব। এক—দুই—তিন—চার, এক—দুই—তিন—চার। প্রত্যেক চার পা চলার পর ওকে ফিরতে হয়। সেলে পা ছড়িয়ে শোয়াও যায় না। রাও একটা নতুন বিস্ময়ে নিজের শরীর, বাহু, উরু ও বুকের দিকে তাকালো। নিজের নাক, কান এবং মুখে হাত দিল। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে যথাযথভাবে আছে। উষ্ণ ও জীবন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ও সঞ্চালিত হচ্ছে। আগামীকাল এই উষ্ণতা, চলমানতা, জীবন. বাহুবিচার, খেয়াল, বাহুর শক্তি ও বুকের জোর ও কামনা-বাসনা চিরকালের মতো শেষ করে দেওয়া হবে—কিসের জন্য? মরণে ওর কোনো ভয় ছিল না। জন্মানো. বড় হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া ও পরিবর্তনের স্বপ্নের মতো সুন্দর হওয়া—তারপর আস্তে আস্তে ঝরাপাতার মত বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া—নিজের মৃত্যুর মধ্যে একটা নবজীবন সুরু হতে দেখা। কিন্তু আগামীকালের মৃত্যুটা কেমন? আজও সে বুড়ো হয়নি। আজও তার শরীরের ত্বক এতটুকু শিথিল হয়নি—এখনো কুঁড়ি সব খোলেনি—সব পাপড়িগুলো ফোটেনি, শাখায় এখনো কুসুম অঙ্কুরিত হয়নি, আজও বর্ষা ঝরেনি—বিদ্যুৎ চমকায়নি। বুলবুল শীষ দেয়নি। কোনো বৃক্ষই বুলবুল ছাড়া সম্পূর্ণতা পায় না।

রাও সেলের পাকা শীতল মেঝের উপর উপুড় হয়ে বসে পড়লো। ও থুৎনিটা ডাণ্ডাবেড়ীর মাথার উপর রেখে চিন্তা করতে লাগলো। মকবুল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়েছিল, লেখাপড়া শিখিয়েছিল, আর কিছুদিন পরে রিক্সাটানার কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল—যে কাজে ওর ফুসফুসের উপর ক্ষতিকর চাপ পড়ছিল। এবং ওকে একটা কাগজের কলে চাকরী জুটিয়ে দিয়েছিল। মিলে এসে হিন্দুস্থানের শহরের বড় বড় পুঁজিপতি ও গ্রামের জমিদারদের ব্যাপক ষড়যন্ত্রের সূত্রটাও খোলাখুলি দেখতে পেল। যার মূল জীবনের প্রতিটি রাস্তায় বিষক্রিয়ার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, মানুষকে আরো মহান করে তুলতে, অবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে, পুরনো জীবনের সাথে লড়াই করতে হয়। কারখানায় এসে রাও লড়াই করতে শিখলো। শুধু লড়াই করতে শেখা নয়, নতুন জীবনের সেই কারিগরদেরও দেখলো। যাদের হাতে পুরনো কাঠের টুকরো আর কাটাছেঁড়া কাপড়ের টুকরো সুন্দর কাগজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ও দেখলো এই হাতে মরা ধাতু হৃদযন্ত্রের মতো এক এক করে গলে গিয়ে কিষানের লাঙল, মোটরের অংশ আর ফুলের মালা গাঁথার সূঁচ হয়ে যায়। নবজীবনের এই কারিগরী দেখে মাটিতে

পোঁতা এইসব শতাব্দীর খেয়াল—যা কয়লায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ওর মনে উদয় হোল। সেই সময়ের কথা মনে পড়লো যেটা লোহায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মনে আসতেই গর্বে মাথাটা উঁচু হয়ে উঠলো। অত্যন্ত শক্ত করে ওর সাথীদের হাত আঁকড়ে ধরলো। কেননা এইসব হাতই এই গুপ্ত ধনরত্নগুলো অন্ধকার গহ্বর থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে এবং মানুষের জীবনকে উন্নত ও সুষমামণ্ডিত করে তুলতে পারে। এই হাতগুলো ও আর কখনো ছাড়বে না। কেননা এই হাত লোকের ভবিষ্যৎ ধ্বংসকারী মুনাফাখোরদের হাত নয়—নয়াজীবনের কারিগর—মজদুরদের হাত।

মিলের একবছরের চাকরী জীবনে ও অনেক কিছু শিখলো। যেগুলো হয়তো দশ বছরের খাটুনীতে ও অন্য জায়গায় এত পরিষ্কারভাবে শিখতে পারতো না। নিজের উপর আস্থা রেখে লড়াই করতে আর পরাজয়ে ঘাবড়ে না গিয়ে শিখলো হরতালকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এখানেও মালিকের গুণ্ডার সাথে বোঝাপড়া হোত। এই গুণ্ডাদেরও সেই মনোভাব—যেমনটি ছিল গাঁয়ের জমিদারের গুণ্ডাদের। কিন্তু এখানে এই গুণ্ডাদের শোধরানো গাঁয়ের থেকে অনেক সহজ। তবুও কয়েকবার ওর উপরে হামলা হয়েছে। কয়েকবার লাঠি ও ছুরির মুখোমুখি হতে হয়েছে। মিল থেকে বরখাস্ত হয়ে কয়েক মাসের জন্য জেলে যেতে হয়েছে। জেলে গিয়ে নাগিগুরের সাথে দেখা। নিজের গাঁয়ের গোয়ালা নাগিগুর। নাগিগুরকে জেলে দেখে রাও বড চিন্তিত। কিন্তু শিগগিরই নাগিগুর ওর চিন্তা দূর করে দিল। নাগিগুর জানালো যে, শ্রীপুরম আর সেই পুরনো গাঁ নেই, ওখানে জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। শতাব্দীর পেছিয়ে পড়া বেগারী, ক্ষেতমজুর, গোয়ালা আর জংলী কোয়ারা অর্থাৎ সমস্ত লোক,—যাদের জমিজমা নেই—নিজেদের সভা গড়ে তুলেছে। আর এরা চল্লিশটা গাঁয়ের জমির মালিক জগন্নাথ রেড্ডীর সাথে নিজেদের জমির বোঝাপড়া করে নিচ্ছে। মারপিট রোজই হচ্ছে—বেগারীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে—এদের উপর হরেক রকমের জুলুম হচ্ছে। কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ছে আর বেগারীরা পরিণত হয়ে চলেছে শার্দূলে। কয়েকটি জায়গায় জমিদারের ইচ্ছা ব্যতিরেকেই বেগারীরা জমি চাষ শুরু করে দিয়েছে, এই সূত্রেই নাগিগুরকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখা হয়েছে।

এসব কথাবার্তা শুনে রাওয়ের খুব আশ্চর্য ঠেকলো। খুশিও হোল।

একদিক থেকে ওর এ কথায় বিশ্বাস হচ্ছিল না যে জঙ্গলের বাসিন্দা, গোষ্ঠী জীবনে পালিত কোয়ারাও এইভাবে নিজেদের বাহাদুর প্রমাণ করতে পারে। হাজারো বছরের গোলামীর শিকল কেটে মুহূর্তের মধ্যে মানুষে পরিণত হতে পারে।

নাগিণ্ডর জানালো কোয়ারাই এই লড়াইয়ে সবচেয়ে আগে রয়েছে। 'তুমি ওদের জমায়েত দেখলে অবাক হয়ে যাবে। আর আমাদের গোয়ালারা তোমাদের বেগারীদেরও পুরোধা হয়ে গেছে। আমাদের গোয়ালাদের তো তুমি জান।' নাগিণ্ডর হাসলো। হাসতে হাসতে ও নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর ও রীতিমত খুশিতে ভরে উঠলো।

'কি ব্যাপার ?' রাও জিজ্ঞাসা করলো।

নাগিণ্ডর নিজের মাথাটা নিচু করে কপাল থেকে শুরু করে মাথার তালু পর্যন্ত প্রসারিত একটা চিহ্ন দেখালো। একটা গভীর ডোরাকাটা ক্ষত। যেন কিসে চামড়াটা পুড়িয়ে দিয়েছে, এই ডোরাকাটা চিহ্ন বরাবর একগাছা চুলও নেই।

'এটা কি করে হোল ?' রাও বড় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমাকে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল'—নাগিণ্ডর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলে', 'জমিদারের আস্তাবলে বন্ধ করে, অন্য সকলের কাছ থেকে পৃথক করে রাখে। দুদিন কিছুই খেতে দেয়নি, মারপিটও করলো, তবু আমার সাথীদের নাম বলিনি। ওরা তারপর আমার মাথার চুল পুড়িয়ে লোহার একটা ডাণ্ডা দিয়ে চামড়াটা উলটিয়ে দিল।……তারপর হাসতে হাসতে বলছিলো, 'আমরা তোমার মাথায় মস্কো রোড তৈরি করছি। এখান থেকে তুমি সোজাসুজি মস্কো পৌঁছে যাবে, বুঝেছ ?' 'কিন্তু আমি আর কি বুঝবো ? ব্যাথায় তো কাতর।' নাগিণ্ডর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। রঘু রাও কিছু বলতে পারলো না। শেষে নাগিণ্ডর নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে খুশি হয়ে রাওকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ভাইয়া, মস্কো কোথায় ?'

'তুমি জাননা ?'

নাগিণ্ডর মাথা নেড়ে বললো, 'না ভাইয়া'। 'মস্কো একটা শহর।' বললো, 'মস্কো একটা খেয়ালও বটে।'

নাগিণ্ডর কিছুই বুঝলো না। সে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি

লেখাপড়া জানিনে, আমি তো জঙ্গলের গোয়ালা। শুধু একটুকুই জানি যে আমার জীবন,—আমারই বা বলি কেন—আমার বাবার বাবাও জন্ম-জন্মান্তরে কখনো জমি দেখেনি। আজ যখন আমাদের জমি পাওয়ার আশা হয়েছে তখন জীবন থাকতে এ আশাটা ছাড়ি কি করে।'

রাও বললো, 'এ আশার নামই মস্কো।'

নাগিণ্ডর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'যদি তাইই হয়—ওরা যদি চায় তো শুধু আমার মাথা তো দূরের কথা গোটা শরীরটাতেই মস্কো রোড বানিয়ে দিক। এই আশা আমি কিছুতেই ছাড়বো না।' রাও নাগিণ্ডরের হাতখানা সজোরে চেপে ধরে বলতে লাগল, 'জেল থেকে বেরিয়ে আমি তোমার সাথে আমাদের গাঁয়ে ফিরে যাব।'

ছয়

কিন্তু রাও যেদিন খালাস পেল, নাগিত্তর সেদিন পেল না। ওর আরও পনেরো দিন জেল খাটতে বাকী ছিল। রাওকে তাই একলাই নিজের গাঁয়ে যেতে হলো। জেল গেটে মকবুল ও অন্যান্য সাথীরা ওকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। রাও যখন মকবুলকে বললো যে সে নিজের গাঁয়ে যেতে চায়, মকবুলও তখন ভাবছিলো যে রাও-এর নিজের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কিষাণ আন্দোলনটা পরিচালনা করা দরকার। অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। মকবুল বলল, 'কিষানদের প্রচণ্ড আন্দোলন এখন আর নিজামশাহীর পুলিশও দাবিয়ে দিতে পারছে না, তাই নিজামশাহী পুলিশ ও রাজাকার সেনারা মিলে জগন্নাথ রেড্ডীর এলাকায় কিষানদের কচুকাটা করার চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু'—রাও জিজ্ঞাসা করলো—'এই জগন্নাথ রেড্ডী তো হিন্দু, আর রাজাকারদের জমায়েত তো মুসলমানী। এই দুয়ে মিল হোল কি করে?'

মকবুল বললো, 'মুনাফা আর জুলুমের কোনো ধর্ম নেই। আর আমাদের দেশের ঘটনাও তো এই যে স্বার্থান্বেষীদের শক্তি পরাজিত হতে থাকলে দাঙ্গাবাজীরইসাহায্য নেয়।'

চলতে চলতে মকবুল রাওকে কয়েকটি বিষয় বলে দিলো। যেখানে ও নিজের যাওয়ার পথে থেমে ওই লোকদের সাথে মিলতে পারতো যাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পুরো জ্ঞান আছে। এদের ধন্যবাদ জানিয়ে, মকবুল ও অন্যান্য সাথীদের আলিঙ্গন করে রঘু রাও নিজের গাঁয়ের পথে রওনা হয়ে গেল।

যতই রাও হায়দারাবাদ থেকে দূরে গাঁয়ের দিকে এগুতে লাগলো ততই সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা ও দুঃখ-কষ্টের চিহ্ন দেখতে লাগলো। প্রথমটায় ও কিষানদের কাজ করতে দেখেছিলো। কিন্তু হায়দারাবাদ থেকে ক্রমশঃ দূরে যেতে ওর সামনে প্রসারিত দৃশ্যপটে মানুষের মনোবলের অভাব দেখা যেতে লাগলো। নিম গাছ, পিপুল

গাছ, বাজরার ক্ষেত, বাবুল গাছে আকাশ বিস্তৃত পরগাছা। অনেক জায়গায় উঁচু রাস্তার উপর একটার উপর আরেকটা কালো পাথর এলোমেলো সাজান রয়েছে। যেন দৈত্য-দানব শিশুরা খেলার সময় একটার পর আরেকটা পাথর রেখে দিয়েছে। এসব ওর জানা-শোনা টুকরো টুকরো ছবি। কিন্তু যারা বাজরার ক্ষেত বুনেছে, চষা জায়গায় ফসল ফলিয়েছে, যারা কুয়া খুঁড়েছে আর গাঁ ও ক্ষেতের মাঝখানে পায়ে চলা রাস্তার পত্তন করেছে অর্থাৎ সেইসব লোক যাদের ইচ্ছায় ও শক্তিতে অবস্থার রদবদল হয়েছে ও রূপান্তর ঘটেছে তারাই উধাও। ছবির বাকী সব একইরকম। সেই রং, সেই অবস্থা যা ওর জীবনে ছোটবেলা থেকে তৈরি হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবুও না জানি কেন প্রত্যেকটি জিনিষ আজ যেন অগভীর দেখাচ্ছে। মনে হয় যেন ছবিটির কেন্দ্রস্থলে কেউ ছিদ্র করে দিয়েছে। বারংবার রাও-এর মন এদের উপর পড়ছিল এবং আবার ঘুরেফিরে আশেপাশে কি একটা জিনিষ সন্ধান করে ফিরছিল।

মৌজা করিমনগরে ইয়েল্লা রেড্ডীর সঙ্গে দেখা করার কথা। কিন্তু গাঁয়ের কাছে আসতেই ও দেখলো সারা গাঁখানা অগ্নিদগ্ধ। পঞ্চাশ-ষাট ঘর সবই ভস্মীভূত। যেগুলোয় খড় ও তালপাতার ছাউনি ছিল সেগুলো সমস্ত ছাই হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র কয়েকখানা ঘরের মাটির দেয়ালটা খাড়া রয়েছে। ইয়েল্লা রেড্ডীর একতলা বাড়িখানা খারাপ মাটি দিয়ে তৈরি, কিন্তু এ বাড়ির অবস্থা অন্য বাড়ির চেয়ে ভাল, কেননা গাঁয়ের অন্যদের চেয়ে তার অবস্থাটাও ছিল ভাল। এই বাড়ির শুধু দেয়ালগুলোই খাড়া ছিল, দরজা খোলা। প্রাঙ্গণে শাহাবাদী পাথরের মেঝে—আর কোণে দুখানা বড় বড় পাথর। একটা জলের লোটা পড়ে রয়েছে। প্রাঙ্গণের মাঝখানে ইয়েল্লা রেড্ডীর মৃতদেহ। দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন। দেয়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে। ইয়েল্লা রেড্ডীর চোখের পাতা খোলা। রাও যতক্ষণ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলো, অবাক বিস্ময়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর অত্যন্ত কষ্ট করে সে তার নিজের চোখ সেখান থেকে সরিয়ে, মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাও মকবুলের কাছ থেকে ইয়েল্লা রেড্ডীর নামে একখানা আবেদনপত্র নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সে পত্র দেওয়ার আর কোনো আবশ্যকতা রইলো না। ইয়েল্লা রেড্ডী নিজেই এই হুকুমনামার প্রতিটি অক্ষর পালন করে দেখিয়ে দিয়েছে। গাঁ থেকে বেরিয়ে ও বুধন জঙ্গলের দিকে চললো। রাস্তায় বহু

বাজরার ক্ষেত অগ্নিদগ্ধ। একটি এরণ্ড চারার পাশে একটি যুবতী মেয়ের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মৃতদেহটি শিয়ালে খাচ্ছে। শিয়ালটি ওর আসার শব্দ শুনে জোরে লাফিয়ে ছুটে পালালো এবং পাথরগুলো গড়িয়ে দিয়ে টিলার অপর পাশে চলে গেল, রাও লাশটা টেনে হিঁচড়ে মাঠের একটা আলের পাশে নিয়ে রাখলো। আলটা ভেঙে তার মাটি ও পাথর দিয়ে লাশটাকে কবর দিয়ে পা ঝেড়ে এগিয়ে চললো। ওর চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছে, গলাটায় খচ্ খচ্ করে কাঁটা বিঁধছে আর ভয়ানক তৃষ্ণা। এ সময়ে সে জলের বদলে রক্তও খেতে পারে।

বুধন জঙ্গলের ঘন ছায়ায় ওর দেহের উষ্ণতা কিছু কমল। ছায়া ঘেরা গাছে পাখি ডাকছে। ওর নিজের চলার শব্দ অথবা ঝোপঝাড়ে খরগোসের খড়-খড় করে চলাফেরা—এছাড়া চারিদিকেই নিস্তব্ধতা। একটা নতুন অস্পষ্ট পায়ে চলা পথের রেখা ধরে ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো। এই নিস্তব্ধতায় রাও উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো। সতর্কও রইলো। আবার কিছুটা আশাও ছিল যে সুযোগ সন্ধান যদি মেলে তো এইখানেই মিলবে। কখনও কখনও চলতে চলতে ওর মনে হচ্ছিল যে গাছের পেছন থেকে যেন কয়েক জোড়া চোখ ওকে দেখছে। যেন কোনো একটা হাত ওর পিঠে ছোরা মারার জন্য পিছন দিকে উঠে দাঁড়ালো, শ্রেফ ঘাবড়ে যাওয়ায় এ দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু এখানে তো কেউ ছিলো না—জঙ্গলে ও নিতান্ত একা।

একটা বড় টিলার উপর ঝোপ ঝাড়ে ঘেরা জায়গা, ও সেই টিলার কাছ দিয়ে যেতেই কে হাঁকলো, 'দাঁড়াও।'

রাও দাঁড়ালো।

দেখলো টিলাটার উপরে একজন কালো বুড়ী আর পাথরের মূর্তির মতো একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। মাথায় সাদা চুল, হাতে বন্দুক। উঁচু লম্বা চেহারা। স্ত্রীলোকটি বন্দুক সোজা করে ধরলো।

তাকে চিনতে পেরে রাও চিৎকার করে উঠলো, 'কাশম্মা।'

স্ত্রীলোকটি বন্দুকের নল নিচু করে মাথায় হাত দিয়ে লোকটিকে চেনার চেষ্টা করতে লাগলো।

রাও চীৎকার করে বললো: আমি রঘু রাও, আমি রঘু রাও মকবুলের সাথী।......

স্ত্রীলোকটি টিলার কাছ থেকে নিচের দিকে দৌড়াতে লাগলো। ওর

পিছু পিছু তিন চারজন পুরুষ টিলাটার পিছন থেকে বেরিয়ে দ্রুত চলে এলো।

রাও-এর একেবারে কাছে এসে কাশম্মা ওকে চিনতে পারলো, সে ওর মাথায় হাত রেখে বলল, ‘আরে, খুব রোগা হয়ে গেছ যে। বেটা তোমাকে আমি তো চিনতেই পারিনি।’

‘জেল কি কখনো মায়ের ঘর হয় মা ?’

‘কবে ছাড়া পেয়েছো ?’

‘পরশু।’

কাশম্মা জিজ্ঞাসা করলো, ‘মকবুল ভালো আছে তো ?’

কাশম্মার স্বরে বড় স্নেহ, গভীর মমতা ও অকৃত্রিম সুর। রাও-এর গলায় কি যেন একটা আটকে যায়। এই স্ত্রীলোকটি ইয়েল্লা রেড্ডীর মা। যার মৃতদেহ করিমনগরে পড়ে থাকতে দেখে এসেছে। এই মা রাও-এর কুশল জিজ্ঞাসা করছে। জিজ্ঞাসা করছে মকবুলের কথা, কিন্তু তার ছেলে, একমাত্র ছেলে যে কিষানের ন্যায্য দাবী নিয়ে লড়তে গিয়ে মারা গেছে, তার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করছে না।

রাও পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলো, ঘটনাটা কবে ঘটেছে ?’ কাশম্মা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, ‘আমাদের গাঁয়ে এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। যেখানে যেখানে কিষাণসভা জায়গীরদার ও দেশমুখের অংশ দিতে অস্বীকার করেছে, সেখানেই এরকম ঘটেছে। হয়তো এর চেয়েও খারাপ। আমাদের গাঁয়ে হামলাটা হয়েছিলো রাতে। সেজন্য রাতের আঁধারে গাঁখানা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে—দিনে হলে একটু কঠিন হোত। কিন্তু রাতের আঁধারে আবার অনেক কিষাণ গাঁ থেকে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতেও পেরেছে। সে-সব লোক এখন আমাদের সাথে আছে।’

রাও কাশম্মার চেহারাখানার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সেখানে ক্ষোভের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোনো ভয়। সে বেশ স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলছে। ইয়েল্লা রেড্ডীর মা নতুন মা হয়ে গেছে। তার এই শান্তচিত্ত ও ক্ষোভ-শূন্যতার কয়েকটি কাহিনী ও শুনেছে। কখনো কখনো মা নিজে ইয়েল্লা রেড্ডীর বিরুদ্ধেও উচ্চকণ্ঠে বলেছে। কেননা ইয়েল্লা রেড্ডী ছিল অবস্থাপন্ন কৃষক ফলে কয়েকটি বিষয়ে ও অবস্থাটা বুঝতে চাইতো না। এইরকম অবস্থায় ওর মা-ই ওকে সঠিক রাস্তায় চালিত করতো। রাও কাশম্মার চেহারাটা গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলো। তেলেগু উপকথার একজন

সাধ্বী স্ত্রীলোকের কথা ওর মনে পড়লো। এই উপকথায় সেই-ই সাধ্বী স্ত্রী—কর্মে দাসী, পরামর্শ দিতে মন্ত্রী, প্রেমে রম্ভা, খেতে দিতে মা, আর রণে সিপাহী হতে পারে। রাও চিন্তা করলো, এটা নতুন উপকথার ব্যাপার। আর অন্ধের গ্রামে গ্রামান্তরে কাশন্নার মতো মা পুরনো উপকথাকে বদলে নতুন উপকথার জন্ম দিয়ে চলেছে।

কাশন্না বললো, 'এখন কি উপায়, কিষানরা তো ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে।'

রাও বললো, 'মকবুলও বলেছে, এবং অন্যান্য সাথীদেরও বক্তব্য হল যে, খাজনা দেওয়া বন্ধ করা ও জায়গীরদারী ট্যাক্স না দেওয়ার অবস্থাটা এখন আর নেই। এখন কিষানসভাকে সোজাসুজি কিষাণদের মধ্যে জমি বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। যাদের জমি নেই তারা এরকম অবস্থায় জঙ্গলে পালিয়ে এসে আশ্রয় না নিয়ে করবেই বা কি? গাঁয়ে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো কি আছে? এদের গাঁয়ে জমি দাও।'

'ঠিক আছে',—কাশন্নার পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক বললো। রাও-এর মনে হলো লোকটি। জঙ্গলের কোয়া জঙ্গলের বাসিন্দাদের ও আমাদের কোয়াদের জমি পাওয়া দরকার। তবেই গাঁয়ের ও জঙ্গলের রাখীবন্ধনটি খুব মজবুত হবে।

'ঠিক আছে,' রাও বললো। 'অন্ধের জংলীরাও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু কম লড়াই করেনি। জংলীগোষ্ঠীর সর্দার আল্লুরি সীতারাম রাজুর সংগ্রামের কথা অন্ধের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানে। আজও লোকে বলে যেখানে অন্ধের জঙ্গল আছে, সেখানেই আলুরি সীতারাম রাজু আজও বেঁচে আছেন এবং বাহাত্তুর কোয়াদের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংগঠিত করছেন।' কাশন্নার সাথীদের মধ্যে একজন ছিল চামার, দ্বিতীয়টি ক্ষেতমজুর। ওরা দুজনেই বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। জমি আমাদের হয়ে গেলে আমরা দেখে নেবো কোন মায়ের দুলাল কিষানদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নেয়। জমি তো গাঁয়ের চামার আর ক্ষেতমজুররাও নেবে।'

রাও বললো, 'ওরাই সবার আগে নেবে। আসলে জমিতে যারা মেহনত করে জমিও তো তাদেরই।'

কাশন্না কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করলো। তারপর ঘুরে পিছনে দাঁড়ানো লোকটাকে বললো, 'রামুলু জঙ্গলের সব কিষাণদের খবর দিয়ে দাও, আমরা

করিমনগর ফিরে যাবো। ওখানে কিষানদের জমি ভাগ করে দেওয়া হবে।' রামুদু দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল। চামার ও ক্ষেতমজুররাও খবর দেবার জন্য পিছু পিছু চলে গেল।

রঘু রাও বললো, 'মা, আমার তেষ্টা পেয়েছে।' কাশম্মা টিলার পিছন থেকে একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে এলো, রাও সেটায় মুখ লাগিয়ে চুষে আধখানা করে দিলো। জল খাওয়ার পর রাও বললো, 'মা, তুমি এসব করে নেবে, নাকি তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি এখানে রয়ে যাবো?'

কাশম্মা বললো, 'না রঘু তুমি যাও, আমি সব করে নেবো।' রাও চলতে চলতে দেখলো যে কাশম্মা টিলার ওপর বসে হাঁটুতে বন্দুক রেখে ওর দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। রাও কিন্তু এটা নিয়ে বেশি চিন্তা না করে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। হঠাৎ কাশম্মা ওকে পিছন থেকে ডাকে, 'রাও শোনো।'

রাও পিছন ফিরে তাকায়। কাশম্মা নিশ্চুপ। অদ্ভুত চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ওখানে বসে বসেই আস্তে জিজ্ঞাসা করলো, 'ওর চোখ তখনো খোলা ছিল?' রাওএর মাথা ঘুরে গেল। ওর মানসপটে এলো কতকগুলো অগ্নিদগ্ধ দেওয়াল। শাহাবাদী পাথরের মেঝে, মেঝেটার উপর একটা লাশ—দেহ একদিকে, মাথা আরএকদিকে, দুটো চোখ নিশ্চল ও প্রস্তরীভূত একটা প্রশ্নে পরিণত হয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—ও মুখে কিছু বলতে পারলো না। ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে নিলো।

কাশম্মা কিছুক্ষণ চিন্তান্বিতভাবে তাকিয়ে থাকে। তারপর ওর সাদা মাথাটা নুয়ে পড়লো। অশ্রুধারা চোখ থেকে গড়িয়ে বন্দুকের উপর নিঃশব্দে ঝরতে লাগলো।

রাও তার মনের ইচ্ছার রাশটা টেনে ধরল। আর কাশম্মাকে একলা রেখে নিজের রাস্তায় এগিয়ে চললো। তার মানে এই নয় যে ও মানুষ নয়, এটাও নয় যে ওর চোখে জল নেই। আবার এটাও নয় যে ওর সাথী ইয়েল্লা রেড্ডীর প্রতি ওর কোনো স্নেহ প্রীতি ছিল না—এসব থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু নিজের রাস্তা ধরে চলে গেল। কারণ, ওর মনে শুধু দুটো খেয়াল—একটা, মানুষের প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথটা কত দুঃখকর হয়। কত তীব্র আঘাত, কত অশ্রুধারা, কত জ্বালাময় হৃদয় অনুভব করে মানুষকে এক

পা, আধ পা, সিকি পা, এমন কি সিকিরও অর্ধেক পা এগুতে হয়। প্রথম খেয়াল হোল এই; আর দ্বিতীয়টি, কাশম্মা আরএকজন নতুন মা। ওর বেদনাক্লিষ্ট মমতা নিশ্চয়ই একটা পথ খুঁজে নেবে। একটা শিশুসন্তান মারা গেলে মাতৃক্রোড় এতটা সম্প্রসারিত হয় যে হাজার হাজার সন্তান মায়ের সেই ক্রোড়ে আশ্রয় নেবার জন্য একত্রিত হয়। এইজন্যই কাশম্মাকে নিয়ে রাও-এর কোনো ভয় ছিল না। এইজন্যই ও কাশম্মার অশ্রু নিঃশব্দে বয়ে যেতে দিয়ে নিজের রাস্তায় এগিয়ে গেল।

অনেক দূর এগিয়ে রাওএর মনে একটা ভাব এলো। এই ফাঁসী সেলে সেটা স্মরণ করে ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। কেননা সেই ভাবটি আসতেই এবং এর উপর ধ্যান করতেই রাও বহু অশ্রুকে বদলে নিতে পেরেছে। সেটি এই যে ও কেন একটি বাজীর বাহক হবে না। কেন এই বাজীকে সে সঙ্গে সঙ্গে কাজে পরিণত করবে না। যাহোক, বেলিমপল্লীর গাঁয়ে ও নিজে জমি বাঁটোয়ারার কাজে অংশ নিলো। নিজের চোখে গৃহহীন জমিহীন কিষানকে আত্মশক্তি সঞ্জাত আনন্দ ও প্রবল উৎসাহে পরিণত হতে দেখলো। পুড়ে যাওয়া ঘর আবার বাসযোগ্য হয়ে উঠলো। গাঁয়ের আবর্জনা দূর করার জন্য পয়ঃপ্রণালী খনন করা হোতে থাকলো। জমিতে চললো হলকর্ষণ। আর কিষাণের বুক এত উঁচু হয়ে উঠলো যে অত্যাচারীরা ভয় পেয়ে গেল। যারা কাল ছিল অত্যাচারী, বিচারক, আর শতাব্দী ধরে মালিক, তারা গাঁ থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বড় বড় শহরে আশ্রয় নিতে লাগলো। বেলিমপল্লীর কিষাণদের দশ পনেরো জনের একটা দল রাও-এর সাথে ছিল যারা অপরাপর গাঁয়ে জমি বঁটোয়ারার কাজে সহায়তা করতে লাগলো। এভাবে যে সব গাঁয়ে রাও যেতে লাগলো সেখানে কৃষকদের বিশাল জমায়েত হয়ে উঠলো একটা তরঙ্গ, যাকে থামাতে চেষ্টা করলেও থামে না—একটা বন্যা যেটা প্রকাণ্ড বান নিয়ে এসেছে—যে পা আগে সিকিরও অর্ধেক চলতো, সে পা এখন দানবের শক্তিতে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। এই বন্যার পা ছিল মাটিতে, আর মাথা ছিল আকাশে। এই গীতের গুঞ্জনধ্বনি সর্বত্র। আগে কিষাণ লাঙ্গল চালাতো মাটিতে, আজ সে লাঙ্গল চালিয়েছে তার ভাগ্যের উপর। আসমান আজ তার পকেটে। গড়ের খিলানগুলি আজ একে একে ভেঙে পড়েছে।

বেলিমপল্লী থেকে পাত্তিপাড়ু, পাত্তিপাড়ু থেকে শ্রীপুরম পর্যন্ত একটা খুশির আলোড়ন। এর নজির আজ পর্যন্ত কখনো দেখা যায় নি। ওর মনে হোল জেলখানার প্রতিটি কোণ যেন আজও সেই খুশির আলোয় উজ্জ্বল।

সাদা ফেনার ফাঁপা ঢেউ-এর তুফান যেন ঢুকেছে ফাঁসী সেলের মধ্যে—সেটি ওকে দোদুল্যমান তরঙ্গগুলির উপর বসিয়ে শ্রীপুরমে নিয়ে গেছে।

পাত্তিপাড়ু থেকে শ্রীপুরম পর্যন্ত।

রঘু রাও অতীতের দিকে ফিরে পাত্তিপাড়ু থেকে শ্রীপুরম পর্যন্ত প্রসারিত কিষাণদের এই লম্বা মিছিলকে দেখলো। আগে কোয়া স্বেচ্ছাসেবকদের দল, তার পিছনে গোয়ালা। আর তারও পিছনে বেগারীদের সার। তারপর নিশানওয়ালা, শঙ্খবাদক, ঢুলি। শেষে মিছিলের মধ্যে একটা রঙীন সুন্দর বন্ধ করা পাল্কী। যার দুদিকে লাল রেশমের পর্দা পৎ-পৎ করে উড়ছে। এই বন্ধ পাল্কীটার মধ্যে ছিল কাগজপত্র। কাগজপত্রগুলিতে জমি বন্ধক দেওয়া ছিল, বন্ধক দেওয়া ছিল জীবন, ইজ্জৎ। শতাব্দী ধরে জমানো এইসব কাগজপত্র অত্যাচারে নিপীড়িত কিষাণরা জমিদারদের কম্পমান হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। কয়েকটি জায়গায় ছিনিয়ে নেওয়ারও দরকার হয় নি। জমিদার নিজেই তার গড়, ঘর-দরজা, অত্যাচারের নিশানা খালি ফেলে রেখেই পালিয়ে গিয়েছে। এই পাল্কীটির পিছনে খোলা একটি পাল্কীতে লোকে রাওকে বয়ে নিয়ে চলেছে, বলতে গেলে প্রায় দৌড়েই। রাও হেঁটে যাওয়ার জন্য রীতিমত জিদ ধরেছিল। কিন্তু লোকে সেটা মানে নি। ওর পিছনে ছিল নাগিশুরের পাল্কী। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নাগিশুর বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎমানসে পাত্তিপাড়ুতে এসেছিলো। এদের পিছনে ছিল কিষাণদের একটা বড় জমায়েত, ঢুলি, নর্তক, আর খুশিতে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেওয়ার দল। বালক, বৃদ্ধ, কিষাণ, স্ত্রীলোক, ছেলে, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী--সবাই নিজ নিজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আজ কারও ঘরে কুলুপ নেই, আজ কোনো চোর, কোনো দোষী নেই। আজ সবাই জমির মালিক।

ধীরে ধীরে পৎ পৎ করে ওড়া রেশমের পরদাওয়ালা বন্ধ পাল্কীখানি জমিদারের গড়ের দরজায় এসে পৌঁছলো। জনতা পাল্কীখানি গড়ের অন্দরমহলে নিয়ে নামিয়ে রাখলো।···অন্দরমহলে আগেই গিয়ে জড়ো হয়েছিলো গাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা। তারা পাল্কীখানি দীপ দিয়ে বরণ করলো, ফুল ছড়ালো। পয়সা ছুঁড়লো এবং স্বাগত জানিয়ে ভজন গাইলো। রাও এইসব কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলো। কয়েকবার ভেবেছিলো ওর গাঁয়ে যখন বিপ্লব গিয়ে পৌঁছুবে তখন ব্যাপারখানা কেমন দাঁড়াবে। গাঁয়ে বিপ্লব আসার ধরণটা ও ভেবেছে হাজার রকমে। কখনো ভেবেছে সেটা হবে এক ধাবমান তুফান, বা সেটা হবে বন্যার গতিবেগের মতো, জোরকদমে

চলা সৈন্যদলের মতো—আবার ভেবেছে, লাখ লাখ সঙ্গিনের মাথায় অজস্র মৃতদেহ নিয়ে আসবে সে বিপ্লব। কিন্তু কল্পনায় এ ছবি কখনো দেখেনি যে ওর গাঁয়ে বিপ্লব আসবে একটি লজ্জাবতী কনের মতো। লাল পর্দার আড়ালে একটি বন্ধ পাল্কীতে চড়ে, আর কেউ তাকে দীপ দিয়ে বরণ করবে, শাখ বাজাবে, স্ত্রীলোকেরা গাইবে ভজন—আর বাহাদুর কিষানরা বন্দুকগুলোর ওপর সিঁদুরের ফোঁটা কাটবে।

রাও ভাবলো এভাবে চিন্তা করাটাই ভুল। হিন্দুস্থানের বিপ্লব তো নিজের ঢঙেই আসবে। এ বিপ্লব আসবে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের মানসিক গড়ন, আমাদের সংস্কৃতি, দেশের সঙ্গীত ও তার সুগন্ধের রঙে রাঙিয়ে। রূপটি বিদেশী নয়, তার চালচলন আমাদের চেয়ে পৃথক হবে না। এক অপূর্ব, নতুন, ভিন্ন রকমের, এমন একটি জিনিষ যা আগে হয়নি ; কেউ কখনো শোনেনি, কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি আপাদমস্তক ভারতীয় আর সেটি চিনে বলতে পারবো যে, 'হ্যাঁ, এ বিপ্লব আমাদেরই, এ বিপ্লব আমাদেরই।'

ঠিক এমনি সময়ে গাঁয়ের বৃদ্ধ নারায়ণ রঘু রাও-এর হাতে আমিনের জমি জরিপের চেনটি দিয়ে বললো, 'বাছা, জমি বাঁটোয়ারা শুরু করো।' রাও চেনটি হাতে নিয়ে বললো, 'এ সময়ে গাঁয়ের আমিনের এখানে আসা উচিত ছিল। শ্রীরামাপুত্তলু কোথায় ?'

এতে খুব জোরে একটা হাসির রোল উপচে পড়লো। কে একজন বললো, 'সে তো জমিদারের আমিন। আমাদের গরিব কিষাণদের আমিন তো সে ছিল না কোনদিনই, তাই তো সে জমিদারের সাথেই চলে গেছে।'

'কোথায় সেই গ্রাম্য পুরোহিত শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী ? এই শুভ মুহূর্তে তাঁর আশীর্বাদ একান্ত কাম্য।' আবার একটা উচ্চহাসির রোল উঠলো। নাগিত্তর বললো, 'এটা জমিদারের রাজতিলক হলে পুরুতমশাই নিশ্চয় হাজির থাকতেন, কিন্তু আজ যে কিষাণের রাজতিলক। অনেক কৃষক একেবারে অধীর হয়ে উঠে বললো, রাও শিগগির করো। জমি বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কোনো আমিন পুরুতের আশায় আমরা বসে থাকতে পারিনে। কয়েক শতাব্দী ধরে আজকের দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছি।' রাও চেনটি হাতে নিয়ে বললো, 'বাজাও তবে ঢোল কাঁসি। চলো সবাই ক্ষেতের দিকে। শুরু হলো আজ শ্রীপুরমের কৃষকদের জয়যাত্রা।'

রাও পা বাড়াতেই ঢোল বাজানো শুরু হয়ে গেল। কিষাণরা খুশিতে

আত্মহারা। বৃদ্ধরা আনন্দে হাসিকান্না শুরু করে দিলো। এমনিতর খুশি আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। স্ত্রীলোকেরা জয়যাত্রার গান শুরু করে দিলো। কিষাণরা এই গানে তাদের স্বর দিলো মিশিয়ে, গানের গভীর গুঞ্জন গুঞ্জরিত হতে লাগলো সারা আকাশে।—

কাপুরুষতা ও ক্ষুদ্র হৃদয়
জানেনা কখনো অন্ধ্র-তনয়
অন্ধ্রজাতির পরীক্ষা আজ
ওঠ, এস সবে, হও সামিল
জয়যাত্রার চলে মিছিল।

সাত

রঘু রাও চোখের কোন থেকে ধীরে ধীরে অশ্রু মুছে নিলো। যে দিনটিতে জমি মিললো, তারও আগের যে চারটিদিন শ্রীপুরমে কৃষকদের জমি ভাগ করে দেওয়ার কাজ চলছিল, সে দিনগুলি তার জীবনের সবচেয়ে মহৎ সময়। জমি বাঁটোয়ারায় ছোটখাটো ঝগড়াও হয়েছিলো। কেউ চেয়েছিল এ অংশ কেউ আবার অন্যটা। আবার কেউ তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি প্রত্যাশী. যে জমি তার ছিল তার চেয়ে কম দেখিয়েছিল। কিন্তু গাঁয়ের প্রবীণতম ব্যক্তি ও পঞ্চায়েতের যারা প্রতিটি ইঞ্চি জমির সাথে পরিচিত, তাদের সহায়তায় খুব সহজেই আপোষ মীমাংসা করে ফেলা গেল।

এই সময়ে রাওয়ের বাবা ভেরাইয়ার কার্যকলাপের কথা তার মনে পড়ে। রাও মনে মনে ঠিক করেছিল যে, গাঁয়ের সব কিষাণ জমি পাবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তার থেকে তার বাবা সকলের শেষে জমি পাবে। কেননা সে তার বাবা।

রাওয়ের বাবা কিন্তু এ কথার অর্থ বুঝতে পারলো না। সেইজন্য বাঁটোয়ারার সময় সে বারবার রাওয়ের সামনে এসে অধৈর্য হয়ে বালকোচিত জেদ নিয়ে নিজের জমির দাবি জানাতে লাগলো। আর আস্তে আস্তে মুচকি হেসে জরিপের চেনটা নিয়ে যেতে লাগলো এগিয়ে। পুত্রের এইরূপ ঔদাসীন্যে হতবুদ্ধি ভেরাইয়া অন্যান্য কৃষকদের নিকট ওর বিরুদ্ধে নালিশ করতে লাগলো। কয়েকবার দুচারজন কৃষক বললো ও যেন নিজের জমিটা আগেই বেছে নেয়। তারা ওর বাবাকে গাঁয়ের সেরা জমির একটুকরো দেবার জন্য তৈরিও ছিল। রাও কিন্তু হেসে সেকথা উড়িয়ে দিলো।

সবশেষে ওর ভাগে শেষ পর্যন্ত জমি মিলবে কিনা সে বিষয়ে ভেরাইয়া যখন সন্দিহান ঠিক এমনি সময় মিললো তার জমি। আর ওর জন্যে, রাওয়ের জন্যে, রাওয়ের ভাবী পত্নী ও ভাবী সন্তানদের জন্য যত জমির আশা করেছিলো, রাওয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ তার চেয়ে বেশি জমি তাকে দিল।

ভেরাইয়া খুশিতে নাচতে নাচতে আনন্দে দৌড়ে নিজের ক্ষেতের মধ্যে চলে গেল। নিজের ক্ষেতের ঝুরঝুরে মাটি উঠিয়ে ছড়িয়ে দিতে দিতে বললো, 'এ আমার জমি, আমার জমি।'

তারপর দৌড়ে নিজের ছেলের পাশে এসে দু'হাত জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

পঞ্চমদিনে জমির শেষ টুকরোটাও যখন ভাগ হয়ে গেল, জমির প্রকৃত মালিকরাই যখন জমি পেল, এমনি সময় রাও একদিন গাঁয়ের বাইরে বেড়াতে গেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাস্তার কোথাও কোথাও শুকনো পাতা হাওয়ার দমকে নড়ে উঠে চারপাশে চক্রাকারে মড়মড় করে উড়তে উড়তে আবার মাটিতে যাচ্ছে পড়ে। চিন্তামগ্ন রাও আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগলো। আস্তে আস্তে ওর পা ওকে ভগবতী নদীর দিকে গেল নিয়ে।

পশ্চিমে শুধু একটা লালচে রেখামাত্র বয়ে গেছে। নদীর কিনারে পৌঁছে রাও একখানা কালো পাথরের উপর বসলো। আস্তে আস্তে অজস্র চিন্তার মধ্যে থেকে ওর চন্দরীর কথা মনে পড়ে গেল। নীলাভ চোখ, চুলে গুজি আটকানো, লাল পাতলা ঠোঁটে দুষ্টু মুচকি হাসি।

বুঝতেই পারলো না চন্দরী ওর সামনে কেমন করে এসে গেছে। কি করে এত তাড়াতাড়ি, এমনি হতবুদ্ধিকর ভাবে, এত জোরে বুক ধড়ফড় করার মাঝেও সে এসে হাজির হোল। রাও মনে মনে জিজ্ঞাসা করলো, চন্দরী তুমি এ সময়ে কোথায়, কোন নদীর কিনারায়, কোন তাঁবুর বাইরে বসে আছ, কার অপেক্ষায়? তোমার বুক কি আজও পবিত্র আছে, না কোনো প্রার্থী তোমাকে পেয়েছে? মনে হোল, ও কখনো চন্দরীকে ভুলতে পারবে না। চিরকাল ও তার আশায় থাকবে, কেননা মানুষ যে প্রেমের কামনা করে অথচ পায় না, সারাজীবনভরই সেও কামনা করে। এটা কোনো অদ্ভুত বা বড় কথা, আজগুবি আকাংক্ষা নয়। আবার আকাংক্ষাটা এমনও নয় যার জন্য মানুষ মরে যায়। কিন্তু এই কামনা মানুষ সারাজীবন ধরে করে। বসতে-হাসতে, খেলতে-নাচতে গিয়ে—সেই প্রাণ, সেই ভালবাসা ও তার ঝিলিক দেখতে থাকে। দেখতে না চাইলেও দেখতে থাকে। চিন্তা না করলেও চিন্তা করে। স্মরণ না করেও স্মরণ করে আর মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের শেষ সীমানায়ও সেই চেহারার রোশনাই দেখা যায়। কেননা এটি মানুষের পবিত্র সুখস্মৃতি—এ স্মৃতি কখনো মন থেকে মুছে যায় না। অথচ এই মুহূর্তটির আগে রাওয়ের মনে হয়েছিলো যে ও চন্দরীর কথা

চিরকালের মতো ভুলে গেছে। জমির প্রেম স্ত্রীলোকের প্রেমের উপর জয়ী হয়েছে। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারলো যে একটি প্রেম অপরটিকে নষ্ট করে না, দুটোই পৃথক কিন্তু একে অন্যের সাথী। এ সময়ে ভগবতী নদীর সামনে চন্দরীদের তাঁবু না দেখে রাওয়ের মনে উদ্বেগ, চিন্তা ও উদাসীনতার তরঙ্গ বয়ে উঠলো। কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। কেননা জমি ভাগ করে দেওয়া যায়, কিন্তু প্রেম তো ভাগ করা যায় না। জমি জরিপ করা যায় কিন্তু প্রেমের মাপ তো জরিপ দিয়ে সম্ভব নয়।

যেদিন ও ক্রন্দনরতা চন্দরীর পাশ থেকে উঠে গিয়েছিলো, সে সময়ে জীবনের এ শিক্ষা তার ছিল না। সেদিন ও রাগের বশে চন্দরীর জীবনের অসহায়তার কথাটা বুঝতে পারে নি। চন্দরীদের গোষ্ঠী যাযাবর, গৃহহীন, নিঃস্ব ও জমিহীন হওয়ায় নানাভাবে ওরা ছিল মালিকের গোলাম। এ অবস্থায় চন্দরীকে বেশ্যা বলা, দুনিয়ার সমগ্র অবস্থাকে অস্বীকার করা একই কথা। হয়তো বা সে সময়ে ও নিজেই চন্দরীর চেয়ে পবিত্র ছিল না—যে চন্দরীর হৃদয়ে ছিল প্রেমের আগুন, চোখে উন্নত জীবনের জন্য অশ্রু। হয়তো বা এইজন্যই ওর কমরেডরা প্রথমেই মীমাংসা করেছিল যে যারা কোয়া বা লম্বাড়ি যাযাবর, জঙ্গলে জঙ্গলে ও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, সবচেয়ে অনগ্রসর, এদেরও গাঁ থেকে জমি দিতে হবে। হয়তো বা এই কমরেডরা চন্দরীর মতো মেয়ের অশ্রুর মূল্য জানতো আর এ কথাটাও জানতো যে জমির প্রতি যে ভালবাসা সেটা মানুষের অন্য সব ভালোবাসার সৃষ্টিকারী, সঙ্গী ও সহায়কারী। এইজন্যই জমি পাওয়ার পর চন্দরী আপাদমস্তক পবিত্র হয়ে যাবে। ও আর কখনই চন্দরীকে ছুঁতে পারবে না। হয়তো বা ওর জন্য একখানা কুঁড়েও কখনো বাঁধতে সক্ষম হবে না। পারবে না তার ছেলেপুলেকে হাতে তুলে নিতে। হয়তো বা নিজের জীবন ওই রেশমের মতো নরম ও মোলায়েম জীবনকে পারবে না ছুঁতে—যে রেশম ছুঁয়ে দেওয়ায় রামালু শেঠি ভরা মেলায় ওকে ভীষণ ধমকেছিল। কিন্তু এ কথাটায় ওর বিশ্বাস ছিল যে ওদের গাঁয়ে মানুষ ও জমির মধ্যে যে সৌহার্দ তৈরি হয়ে উঠেছে সেটা এতই সুন্দর যে তার সৌন্দর্য রঙিন প্রকাশমান জীবনের অন্যান্য সৌহার্দের সঙ্গে মিশে যাবে। এবং আর কোনো চন্দরীকে ভগবতী নদীর তীরে বুকের পবিত্রতার জন্য কাঁদতে হবে না। এই আদর্শে বিশ্বাস—এই হতবুদ্ধিকর আঘাত বুকে নিয়ে ও ভগবতী নদীর কিনার থেকে উঠে গাঁয়ের দিকে ফিরে চলে যায়।

যাহোক, চন্দরীর ভালোবাসা তো রাওয়ের নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু জমিদারের গড়ের ব্যাপারটা গোটা গাঁয়ের লোকের। ওই গড়টাকে নিয়ে কি করা যায়? জমিদার পালিয়ে যাওয়ার পর গড়টি খালিই পড়েছিল. এই প্রথম কিষানরা জমিদারের ঘর দেখলো, তার আগে তো কেবল দরজাটাই দেখেছে। যেখানে তাদের বেগারখাটা, খাজনা দেওয়া, জায়গীরদারী ট্যাক্স দেওয়া, জমি ক্রোক করানোর এবং কখনো কখনো জমিদারের গুণ্ডাদের দিয়ে চাবুক মারানোর জন্য ডাকিয়ে আনা হোত; কেউ কেউ জমিদারের কাছারিটা দেখেছিলো। ভাগ্যহীনা কিছু স্ত্রীলোক জমিদারের প্রমোদকাননও দেখেছে। কিন্তু এর আগে জমিদারের বড গড়টার পিছনে বড় ঘরে, ছাদওয়ালা বারান্দা, প্রশস্ত অঙ্গন, লম্বা থাম আর মার্বেল পাথরের মেঝেওয়ালা ঘরগুলো যে কেমন তা কেউ সঠিক বলতে পারতো না। প্রথম চার পাঁচদিন যখন কিষানরা জমি বাঁটোয়ার কাজে লেগেছিল তখন কারো এই শয়তান গডটার কথা মনেই পড়ে নি। কিন্তু জমির সমস্যাটা মিটে যাওয়ার পর কিষানরা, তাদের স্ত্রী, বিশেষ করে ছেলেপুলেরা একের পর এক গড দেখতে রওনা হোল. তারা দরজায় টোকা মেরে দেখতে লাগলো। শিশুরা মার্বেল পাথরের মেঝেয় শুয়ে হাসতে লাগলো, থামগুলির আড়ালে তারা লুকোচুরি খেলছিলো এবং হাততালি দিয়ে উঁচু দেয়ালে তাদের প্রতিধ্বনি শুনে খুশি হয়ে হাসির রোল তুলছিলো। অতি বৃদ্ধ কিষানরাও এমন হতবুদ্ধিকরভাবে অন্দরমহলটা দেখছে যেন ওরা কোনো একটা আশ্চর্যজনক জায়গায় ঘোরাফেরা করছে। গড়ের কোথাও কিন্তু আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না, ছিল না কোনো অদ্ভুত প্রাণীর বাস। অঙ্কের প্রতি গাঁয়েই গড় আর তার এক একখানা ইট কিষানদের রক্তে তৈরি।

গড়ের সম্বন্ধে মীমাংসাটা সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকেরাই করলো। তারা বললো, অন্দরমহলের অংশটি স্ত্রীসভাকে দেওয়া হোক। অবসর সময়ে স্ত্রীলোকেরা সব এখানে এসে মিলবে এবং হস্তশিল্পের কাজ করবে। বড় কাছারী ঘর সম্বন্ধে মীমাংসা করলো পঞ্চায়েৎ। তাদের পঞ্চায়েৎ বসবে এখানে। গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপ এমন গরম হয় আর পাথরগুলো এত তেতে ওঠে যে সেখানে বসে ঠাণ্ডা মেজাজে কোনো বিচার-বিবেচনা করা সম্ভবই নয়।

গড়ের গুদামে থাকবে জমা ফসল। জমিদারের প্রমোদকাননটি ছিল খুব বড়। রাও ভাবলো এখানে একটা শিশু বিদ্যালয় খুলতে হবে, কেননা স্কুলমাস্টারকেও যে জমিদার সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

'কিন্তু শিশুদের শিক্ষা দেবে কে?' পুলম্মা প্রশ্ন করলো। বড় কঠিন প্রশ্ন। গাঁয়ের শিক্ষিতরা ছিল পুলিশ, পাটোয়ারী, পুরোহিত আর জমিদারের কর্মচারী, তারা সবাই গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। সারা গাঁয়ে শিক্ষিত লোক একটিও নেই। কেননা জমিদারের বিবেচনায় লেখাপড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। লেখাপড়া শেখার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয় মনে নতুন চিন্তা। কিষাণ—যারা কলুর বলদ—তারাও নিজেদের মানুষ ভাবতে শেখে। অথচজমিদারের প্রয়োজন কলুর বলদের, মানুষের নয়।

শেষে রঘু রাও বললো, 'আমি হায়দারাবাদ থেকে কোনো শিক্ষিত লোক অনিয়ে নেব।' 'ততদিন পর্যন্ত কি হবে?' বুড়ী পুলম্মা পুনরায় প্রশ্ন করলো। 'ততদিন পর্যন্ত আমিই পড়াবো।' রাও বললো। বুড়ী পুলম্মার চোখ খুশিতে চকমক করে। রাও তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কেন খুশি হচ্ছো বুড়ীমা, তোমার তো কোনো ছেলেপুলে নেই যে পড়বে।'

বুড়ী পুলম্মা গভীর আগ্রহের সাথে মাথা নেড়ে বললো, 'না আমি নিজেই পড়বো।'

আট

রঘু রাও ফাঁসী সেলের ঠাণ্ডা কালো মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। এ পর্যন্ত তো সবকিছুই নির্বিবাদে কেটেছে। কিন্তু এরপর যা-কিছু ঘটেছে সেগুলি স্মরণ করতে ওর খুব অস্বস্তিকর মনে হল। গাঁয়ে যেভাবে জমি বাঁটোয়ারা হয়েছিলো, তেমনিভাবে আরো শত শত গ্রামেও হয়েছিলো। চার মাসের মধ্যেই দশ লাখ একর জমি কিষানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া গেল। জমিদার আর দালালরা চলে গেল শহরে। সেখানে থেকে রাজাকাররা নিজামশাহী সৈন্য ও পুলিশের সহায়তায় গ্রামে হামলা করতে লাগলো।

শ্রীপুরম গ্রামেও জগন্নাথ রেড্ডী দু'বার হামলা করেছিলো। কিন্তু দু'বারই গাঁয়ের কিষানরা বীরত্ব ও তেজস্বিতার সাথে এই অত্যাচারের মোকাবিলা করে এবং নিজেদের ঘর, জমি, স্ত্রীলোক ও পল্লীদের ইজ্জৎ রক্ষা করেছিলো। দু'বারই জগন্নাথ রেড্ডীকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছিয়ে আসতে হয়। গাঁয়ের বহু কিষানও মারা গেছিল। আর রঘু রাও নিজে এ সময়ে জখম হয়ে গেল।

তারপর গাঁয়ের লোকেরা একদিন শুনলো যে হায়দরাবাদ কংগ্রেসের নেতৃত্বে এসেছে। বহু লোক ভীষণ খুশি, এবার নিজেদের দেশের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব হয়েছে। এবার আমাদের কথা শোনা হবে আর জগন্নাথ রেড্ডীকে দেওয়া হবে সাজা। এই উপলক্ষ্যে গাঁয়ের অধিকাংশ লোকই আলোকসজ্জা করার সিদ্ধান্ত নিলো, কিছু লোক অবশ্য এর বিপক্ষে ছিল। রঘু রাওয়ের মনেও অবশ্য নানাধরণের প্রশ্নের উদয় হয়েছিলো। কিন্তু ও কিছু বলেনি। তাই শ্রীপুরমে আলোকসজ্জা করা স্থির হয়েছিলো, গাঁয়ে, মন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে, গড়ের উঁচু দরজার উপর, এমনকি আর একটু এগিয়ে গড়ের উপরেই আলোকসজ্জা করা হলো, শত শত দীপ জ্বললো। আর দূর দূর গ্রাম হতে লোক এই আলোকসজ্জা দেখতে এলো, এবং স্বরাজের জন্য এলো একে অন্যকে শুভকামনা জানাতে। স্ত্রীলোকেরা ভজন

গাইতে লাগলো। একদিকে বুড়রা কথা হতে থাকলো, গড়ের বাইরের ময়দানে শিশুরা খেলতে লাগলো।

এমনি সময়ে গ্রামের উপর একখানা উড়োজাহাজ দেখা গেল উড়তে। অনেক লোক এইসব তামাসা ছেড়ে আকাশে উড়ন্ত হাওয়াই জাহাজ দেখতে লাগলো। উড়ো জাহাজ গাঁয়ের কাছাকাছি দুতিনবার উড়ে নেমে এসে অনেকগুলি কাগজ ছড়িয়ে দিলো, তারপর উপরে উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল। কিষানেরা ছুটলো ক্ষেতে কাগজগুলো কুড়িয়ে আনতে। গাছের শাখাপ্রশাখা থেকে, ঘরের চাল থেকে কাগজ কুড়িয়ে আনা হলো। শিশুরা ক্ষেত থেকে কাগজ উঠিয়ে নিয়ে এলো। একটি স্ত্রীলোকের কোলের উপর পড়লো একখানা কাগজ। সে সেটা নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে রাওয়ের কাছে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাওয়ের কাছে এসে জমা হোল শত শত কাগজ।

রাও এইসব ছাপানো কাগজগুলো পড়তে শুরু করলো। শত শত কিষান কাগজের আশেপাশে এসে জমেছে। 'রাও বলো এতে কি লেখা আছে। বলো, রাও, এই ছাপানো কাগজে কি বলছে।' আর একজন এসে বলল 'আমার কাগজটাও দেখ এতে কি লেখা আছে।' অনেক লোক নিজের নিজের কাগজ ওর সম্মুখে ধরলো।

রঘু রাও দু'তিনটে কাগজ পড়ে বললো, এ কাগজ কংগ্রেসের, এ সবগুলিও তাই। সবগুলির মধ্যে একটা কথাই লেখা।

'কি আছে, জলদি বলো। আমাদের কংগ্রেস কি বলছে ?'

কংগ্রেস বলছে যে, যে-সব কিষান জমিদারদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা জমি জমিদারকে ফিরিয়ে দিক। কেননা, শেষ অবধি জমিদার তো কিষানের ভাই। ভাইয়ের ন্যায্য জিনিস ভাইয়ের ছিনিয়ে নেওয়া উচিৎ নয়। তাই কিষানদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তারা নিজেরাই জমিদারকে জমি ফিরিয়ে দিক। রাও কাগজ পড়ে কিষানদের চেহারাগুলি দেখতো লাগলো।

জমায়েতে বহুক্ষণ নিস্তব্ধতা। শেষে একজন কিষান অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললে, জমিতে যে চাষ করে, কাজ করে, পরিশ্রম করে, জমি তো তারই। যে অন্যের রোজগারের উপর নিজের বাড়ি তৈরি করে, আমাদের স্ত্রীদের বেইজ্জত করে, জমি তার হয় কি করে ? কংগ্রেস অন্ধ্রের কিষানদের বলছে যে, তারা জমিদারের জমি ফিরিয়ে দিক। অথচ যারা শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধরে আমাদের জমি জবর দখল করেছে সেই জমিদারদেরই কিছু বলছে না।

রাও বললো, 'ও তো তোমার ভাই। কাগজে এইরকমই লিখেছে।'

'ভাই হবে ওরা কংগ্রেসের,' আরেকজন কিষাণ চিৎকার করে বললো, 'ওরা তো আমাদের দুশমন।'

বুড়ী পুলম্মা রেগে গিয়ে বললো, 'যে যাই বলুক, হাওয়াই জাহাজ ছেড়ে যদি কেউ স্বয়ং ভগবানকেও এখানে ডেকে আনে, তবুও আমি আমার জমি জমিদারকে ফিরিয়ে দেব না। এই কথা বলে ক্রোধভরে বুড়ী গড়ের দরজার দিকে দৌড়ে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে দিলো এবং অতি দ্রুত অন্যান্য প্রদীপগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই গড়ে আঁধার এলো নেমে। গাঁয়ের সব দীপগুলি গেল নিভে। কিষাণরা হতবুদ্ধি হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

তারপর পুনরায় জগন্নাথ রেড্ডী পুলিশ ও ফৌজ নিয়ে এসে শ্রীপুরম দখল করে নিলো। গড়ের ভিতর শিশুদের পড়ানোর সময় রঘু রাও গ্রেপ্তার হোল।

রঘু রাওয়ের বিরুদ্ধে আনা হোল রাজাকর হত্যার অভিযোগ। মোকদ্দমা চললো। ওর মৃত্যুদণ্ড হোল।

কাল সকালে সাতটার সময়···

রাও জিজ্ঞাসা করলো ; সত্যিই কি ও নরঘাতক ? নরঘাতক এক অথবা দুই, অথবা অনেক রকমের হয়, যাদের লোকে মনে রাখে, যাদের ঘৃণা করে, লোকে যার প্রতিশোধ নিতে চায়। অথবা নানা ধরণের উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে মানুষ খুন করে ফেলে। তা সে ঘৃণার আতিশয্যেই হোক অথবা প্রেমেই হোক।

এখানে তো এরকম মরণের কোনো আকার নেই, নেই এরকম ধরণের কোনো আতিশয্য। রাতের আঁধারে পুলিশ ও ফৌজের সহায়তায় রাজাকররা ওর গাঁয়ে আক্রমণ করেছিলো, সামনে তখন ছিল না কোনো আকার, ছিল শুধু একটা অত্যাচারীর অন্ধ শক্তি। সে প্রথমে দেখেছে এই শক্তির দ্বারা গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। দেখেছে আগুনের শিখায় ক্ষেত-খামার ভস্ম হয়ে মিশে যেতে, দেখেছে ইয়েল্লা রেড্ডীর খোলা চোখ। দেখেছে শিয়ালে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ খাচ্ছে। আর দেখেছে অনেক অগ্নিদগ্ধ গ্রাম, অনেক মৃতদেহ আর অজস্র বেইজ্জতি। এইসব দেখেই সে একটি চরম

প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ও এতে কারও কোনো চেহারা দেখে নি। শুধুমাত্র গ্রামে ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের ছায়া দেখেছিল। ও এগিয়ে গিয়ে সেই অত্যাচারকে সঙ্গীনের মুখে রুখেছে।

জুলুমের প্রতিবিধান যদি পাপ হয়, নিজের প্রাণ রক্ষা করা, নিজের ইজ্জৎ বাঁচানো, ক্ষেতের স্বর্ণশীষ রক্ষা করা যদি পাপ হয়, তবে জীবনধারণ করাটাই পাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া এবং হৃদ্‌স্পন্দনও পাপ।

রাও শেষবারের মতো নিজেকে আরএকবার জিজ্ঞাসা করলো। শেষবারেও ওর নজরে এমন অত্যাচারীর চেহারাটাও এলো না যাতে ওর প্রাণ লজ্জিত হয়ে যায়। এই পর্যন্ত পৌঁছে ওর নিজের সমগ্র জীবনের পাতাটিই উল্টে দিয়ে বইখানা বন্ধ করে রেখে দিলো। অত্যন্ত আনন্দের সাথে মৃত্যুর চেহারা দেখার জন্য ও আজ প্রস্তুত।

নয়

ফাঁসী সেলের দরজাটা আবার খুলে গেল. দরজায় ওর বাবার চেহারা দেখা গেল, পিছনে বুড়ো ওয়ার্ডার। তার গভীর কালো চোখদুটো জলে ছলছল করছে। ভেরাইয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ওর কাছে গিয়ে থেমে গেল। রাও ধীরে ধীরে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'বাপু বস।' ভেরাইয়া ও রঘু দুজনেই ফাঁসী সেলের মেঝের উপর বসে পড়লো।

ঠোঁট দুটো কাঁপছে ভেরাইয়ার। তার মাথাটা একটা অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব অবস্থায় ধীরে ধীরে কাঁপছিলো। অনেক কিছুই তার বলার ছিল। কিন্তু হয়তো বা কিছুই সে বলতে পারবে না। তার এই অদ্ভুত অবস্থা দেখে রাওয়ের প্রাণ উঠলো কেঁদে। অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'গাঁয়ের অবস্থা কেমন ?'

গাঁয়ে এখন আর কেউ নেই। নওজোয়ানরা সব গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকি যারা ছিল তারাও জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। সেখানে রাতদিন পুলিশ ও ফৌজ এদের গ্রেপ্তার করার জন্য যায়। আবার মাঝে মাঝে মাঝরাতে জঙ্গল থেকে গুলির আওয়াজ আসে। বুড়ী পুলম্মা বলে, 'আরো একজন গেল।' তারপর অট্টহাসি হাসতে থাকে।

'বুড়ীমা পুলম্মা ?' রাও জিজ্ঞাসা করলো।

'মা পুলম্মা পাগল হয়ে গেছে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য রাও চুপ। তারপর বললো, 'জগন্নাথ রেড্ডী ?'

জমিদার তো গড় থেকে বেরোয় না। ফৌজ পুলিশের বিরাট পাহারা ; তা হয় গড়েই রয়েছে, নয় চুন্দীর মোড়ে। প্রত্যেক কিষাণকে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যেতে হলে তালাসী দিতে হয়।

তারপর আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা। ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। সে আস্তে আস্তে বললো, 'আপীল নামঞ্জুর হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'রত্তু ধোবী বলছিলো যে জগন্নাথ রেড্ডী বলেছে রঘু রাও ক্ষমা চাইলে ওর এই সাজা হোত না।'

'কেন ক্ষমা চাইব?' রাও রেগে যায়। ভেরাইয়া নরম স্বরে বললো, 'আমি তো কিছু বলি নি। রত্তড়ু বলছিলো।'

'তোমার কথাটা কি বাবা।'

ভেরাইয়া ধীরে ধীরে থেমে বললো, 'কখনো কখনো আমার মনে হয়, তুই যা-কিছু করেছিস, ঠিকই করেছিস। আবার কখনো ভাবি আমার যে একটিমাত্র ছেলে।' ভেরাইয়া মাথা নিচু করে।

রাও নিজের হাতখানি বাবার কাঁধে রেখে বললো, 'বাবা তুমিই আমাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিলে গড়কে, আজ তুমি কি সেটা ভুলে যেতে বলছো?' 'না'—ভেরাইয়ার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে। 'কিন্তু বেটা, আমি যে একটা অশিক্ষিত মূর্খ কিষাণ। কখনো কখনো ভেবে ঠিক করতে পারিনে, আমার একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নেওয়া হোল কেন। কখনো কখনো রাতে জঙ্গল থেকে গুলির আওয়াজ আসলে রাত আরো কালো বলে মনে হয়।'

রঘু রাও হাতখানি বাবার কাঁধ থেকে উঠিয়ে না নিয়ে জোরে চেপে ধরলো। ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা ওর বাবাকে বুঝিয়ে বলতে থাকে।

'বাবা, তোমার সেই মেলার কথা মনে পড়ে, যেখানে রামাইয়া শেঠির দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি রেশমের একটি থানে হাত দিয়েছিলাম বলে রামাইয়া শেঠি আমাকে গালাগালি দিয়েছিলো। তুমি রেশমের থান থেকে আমার হাতখানা সরিয়ে নিয়েছিলে। হয়তো সে সময়ে তুমি তোমার ছেলের মনোভাবটা জানতে যে জগন্নাথ রেড্ডীর ছেলে প্রতাপ রেড্ডীর মতো আমি রেশমের জামা পরতে চাই। কিন্তু তুমি হয়তো মনে মনে জানতে যে বেগারীদের জন্য রেশম নয়—রেশমের সবটাই ওধারের। সমস্ত ক্ষুধা এধারে, আর সমস্ত ফসল ওধারে। সমস্ত অপমান আমাদের আর সমস্ত ইজ্জৎ ওদের। বাবা, রেশমের থান ছুঁতে চেষ্টা করা, আর যে-যুগের মানুষ রেশম, ক্ষেত ও মখমলের জন্য কাঁদবে না সেই যুগকে তাড়াতাড়ি আনার চেষ্টা করার মতো অন্যায় ছাড়া তোমার ছেলের অপরাধ আর বেশি কিছু নয়। এই একাগ্র লক্ষ্যের জন্যই তোমার ছেলেকে কাল সকাল সাতটার সময় ফাঁসী দেওয়া হবে। ব্যস, এ ছাড়া আমার আর কোনো অপরাধ নেই বাবা।'

ভেরাইয়া কাঁদতে লাগলো। রাও বললো 'তুমি কাঁদলে দুনিয়ার লোকে কি বলবে ? গাঁয়ের লোকেরা কি বলবে ? জমিদারের গড় তোমাকে দেখে কতই না খুশি হবে !'

ভেরাইয়া অশ্রু মুছে নিলো। বহুক্ষণ ধরে রঘু রাও বাবাকে বোঝাতে লাগলো। আজ যেমনভাবে ওর বাবার মনে সবকিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছে, এত গভীর মমতা ও দরদের সঙ্গে সে আর কখনো তার বাবার সঙ্গে আলাপ করেনি।

যা-কিছু ওর ছিল, যা-কিছু ভাবনাচিন্তা করেছে যা-কিছু ও করতে পারেনি কিন্তু করতে চেয়েছে, তার সবটাই ও আজকে তার বাবার মনের মধ্যে উজাড় করে দিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছিলো। রেশমের জামার কথাটি ওর বাবা বুঝতে পেরেছিল, এইজন্য বাবাকে হায়দরাবাদের গল্প শোনালো। কেমন করে রেশমের জামার জন্য ওর মনটা ছটফট করছিলো, সেইজন্য কত যত্ন করে কয়েকটি টাকা একত্র করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এমন কিছু একটা হয়ে গেছে যার ফলে ওর জীবনের এই আকাঙ্ক্ষাটি আর মিটতেই পাবে নি। অত্যন্ত সাধারণ কথা কিন্তু এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথার জন্যই, রেশমের একটি জামার জন্য, ফসলের একটি কণিকার বা ইজ্জতের আনন্দের জন্য, সৌন্দর্যের একটি রশ্মির জন্যই বেগারীদের দুনিয়া বন্ধ্যা। দুনিয়ায় এই বন্ধ্যাত্ব কতদিন চলতে পারে। উপর থেকে কেউ এদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করবে না। বেগারীদের কাজ বেগারীদের নিজেদেরই করতে হবে। নচেৎ হাজার হাজার বছরের মতো আজও রেশম ওধারেই থাকবে আর অন্যায় অত্যাচারও থাকবে এধারেই।

অনেকক্ষণ ধরে রাও বাবাকে বোঝাতে লাগলো। বাবাও গভীর মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনতে লাগলো। পিতাপুত্র দুজনেই একে অপরের এত কাছাকাছি হয়ে নিরুদ্বেগচিত্তে কথাবার্তায় মগ্ন ছিল যেন ওরা গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে। অকস্মাৎ কে যেন ফাঁসী সেলের দরজাটায় ধাক্কা দিলো···, রাও ও ভেরাইয়া দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। দরজার বুড়ো ওয়ার্ডার পাহারায় ছিল। সে মাফ চেয়ে বললো, এখন আমার ডিউটি শেষ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাই ভেরাইয়াকে এখন চলে যেতে হবে। নতুন ওয়ার্ডার যদি দেখে ফেলে তো সেটা ঠিক হবে না।

ভেরাইয়া উঠে দাঁড়ালে রাও তাকে জড়িয়ে ধরলো। আলিঙ্গনবদ্ধ

অবস্থায় ভেরাইয়া বললো সকালে গাঁ থেকে ফিরে পুনরায় সে এখানে আসবে। 'কিন্তু এখন তুমি গাঁয়ে যাচ্ছই বা কেন? এই শহরেই পড়ে থাকো অথবা জেলের বাইরে কোথাও শুয়ে পড়ো।'

ভেরাইয়া বললো, 'না, আমি গাঁয়ে চলে যাবো, সকালেই এসে পড়বো আজ সারা রাতটাই যদি চলতে পারি তবেই ঠিক হবে, নাহলে…।' ভেরাইয়া কথাটি শেষ না করেই ওখান থেকে চলে গেল।

ফিরে যখন এলো তখন গাঁয়ে সবাই শুয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র পুলম্মার কুঁড়েখানিতেই আলো, দরজাটা খোলা। ধীরে ধীরে ভেরাইয়া পুলম্মার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ওকে দেখে ভেরাইয়া খুবই বিব্রত বোধ করে। পাগলী পুলম্মা এখনো জেগে আছে। তার চোখে রীতিমত বিভ্রান্তি ও ভয়ের চিহ্ন। ভেরাইয়াকে দেখেই পুলম্মা খাট থেকে নেমে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। ওর কানে কানে কথা বলতে শুরু করলো। 'কেমন আছে আমার ছেলে?' এধার ওধার তাকিয়ে পুলম্মা জিজ্ঞাসা করে।

'ভালো আছে, তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে।'

'বেঁচে থাকুক বেটা আমার, যুগযুগ বাঁচুক।' পুলম্মার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল। অকস্মাৎ একটা অট্টহাসি। ভেরাইয়া উৎকণ্ঠায় তার দিকে দেখতে লাগলো। পুলম্মা তারপর হাসতে হাসতে থেমে গেল আর ভেরাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভেরাইয়া আমি পাগল নই, হ্যাঁ কখনো কখনো আমার মনটা এত ঘাবড়ে যায় যে আমাকে হাসতেই হয়। না হাসলে মরে যাবো।

ভেরাইয়া চুপ। পুলম্মা ওর দিকে চেয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই তোমার মনে কোনো কথা রয়েছে। আমি তোমাকে জানি। নিশ্চয় তোমার মনে কোনো একটা কথা তোমায় পীড়া দিচ্ছে। বলো, সেটি কি?'

ভেরাইয়া বললো, 'না মা, কোনো কথা নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে, বলো। না হলে আমি চিৎকার করে হাসবো।'

ভেরাইয়া থেমে থেমে বললো, 'আমার মনে হয় ছেলে রেশমের জামা পরতে চায়।' 'রেশমের জামা?' পুলম্মা হাসলো। 'রেশমের জামা, কিরকম কথা বলছো! রঘু নিজে তোমাকে বলেছে?'

'না না, ও কিছুই বলে নি। কিন্তু আমার মনে হল ওকে যদি রেশমের জামা পরাতে পারি তবে মরার সময় ও বেশ খুশি হবে।'

পুলম্মা জোরে জোরে হাসতে লাগলো। 'রেশমের জামা! হা-হা-হা!

রেশমের জামা। এটারও তো বেশ মজা আছে। হা-হা-হা। ভেরাইয়া তুমি তো গোড়াতেই আহাম্মক ছিলে। রেশমের জামা। হা হা-হা। এ গাঁয়ে কার কাছে রেশমের জামা আছে? ভেরাইয়া, তুমি একটা বিলকুল আহাম্মক।' পুলম্মা জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

ভেরাইয়া নরম সুরে বললো, 'তুমি বুঝতে পারছো না পুলম্মা। তুমি আমার, বাবার মনটা বুঝতে পারছো না। আমার মনে পড়ে যখন একটি তালপাতার ছাতি কিনে দিয়েছিলাম তখন ও কী খুশিতেই না আমার দিকে তাকিয়েছিলো। ওর এক একটা খেলনার কথা আমার মনে পড়ে। তুমি তো জানো, বেগারী নিজের ছেলেকে বেশি খেলনা দিতে পারে না। খেলনা খুব কম বেগারীর ছেলের জীবনেই এসেছে। খেলনার আকাঙ্ক্ষাটি বেশি থেকে যায়। আজ যখন আমার ছেলে, জোয়ান ছেলে, বাইশ বছরের রঘু রাও রেশমের জামার কথা বলছিলো, আমি তখন ওর চোখে সেই বালসুলভ ঔজ্জ্বল্য, সেই শখ দেখলাম, যেটি বাবার মনকে মুঠির মধ্যে ভরে ফেলে। পুলম্মা তুই তো মা, তুই এসব কিছু জানিস না?'

পুলম্মা মাথা নিচু করলো, 'আমার তো সবই মরে গেছে। একটাও নেই। কেউ মরেছে রোগে, কেউ হয়েছে প্লেগের শিকার। কেউ মরেছে জেলে বাকি যারা ছিল তাদের জমিদারই খেয়ে ফেলেছে। আমার তো সবাই মরে গেছে, ভেরাইয়া। আমি আর এখন কিছুই জানি না।'

ভেরাইয়া বললো, 'গাঁয়ে কারো কাছে রেশমের জামা আছে?' পুলম্মা জোরে জোরে হাসতে লাগলো। পুলম্মার অট্টহাসিতে আশপাশের দু'চারজন কিষাণ ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ভেরাইয়াকে দেখে তারা উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার, পাগলী হাসছে কেন?'

পুলম্মা বললো, 'পাগলী আমি না, যারা বলছে পাগল তারাই। ছেলের জন্য আমার রেশমের কামিজ চাই।'

ভেরাইয়া সমস্ত ঘটনাটি তাদের বললো। ভয়ে ভয়ে তারা বললো, 'ভেরাইয়া তোমার মনের অবস্থা আমরা বুঝেছি। কিন্তু এমনি সময়ে রেশমের জামা আসবে কোথা থেকে? এই রেশমের জামা নিয়ে বৃথাই বাক্যব্যয় করছো। সকালে রাওয়ের ফাঁসী হবে, আর তুমি রেশমের জামা খুঁজে বেড়াচ্ছো। রাও যদি শোনে যে ওর বাবা মৃত্যুর সময় কিরকম ঝঞ্ঝাট করেছে তো রেগে যাবে।' জনৈক কিষাণ বললো, 'গোরম্মার বিয়ে হবে সামনের মাসে। চলো তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করি। বিয়ের জন্য সে

রেশমের কাপড় এনে থাকতেও পারে। ভেরাইয়ার মনের আশাও মিটবে।' আরেক কিষাণ বললো, 'তুমিও তো আচ্ছা বেওকুফ্। গোরম্মার বাবার কাছে রেশমের কাপড় কেনার পয়সাই বা কোথায় ; বেওকুফ্ বনে যেও না।'

ভেরাইয়া কুণ্ঠার সাথে বললো, 'যাই হোক, জিজ্ঞাসা করতে দোষ কি ?' দু'তিনজন কিষাণ ভেরাইয়ার সাথে গোরম্মার বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিলো। এক বৃদ্ধ বললো, 'কিন্তু পুলিশ এসে যদি জিজ্ঞাসা করে গাঁয়ের লোক রাত্রে এত কী ফুসুর ফুসুর করছে তবে কি হবে ?' জনৈক কিষাণ চট্ করে বললো, 'সেটা দেখা যাবে। তুমি চলো জী, গোরম্মার ঘর।'

এরা যে-সব জায়গা দিয়ে গেল সেইসব জায়গায় কিষাণরা জেগে উঠে এদের দলে মিলে যেতে লাগলো। রেশমের জামার কথাটাও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এইসব লোক গোরম্মার বাড়ি পৌঁছনোর আগেই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিলো। গোরম্মার বাবা জোড়হাত করে বললো, 'আমার গোরম্মার বিয়ের জন্য যে-সব কাপড় কিনে রেখেছি সে সমস্তই এই খাটের উপর রাখা আছে। দেখো, এতে একটুকরোও রেশমের কাপড় নেই। ঘরও তল্লাস করে দেখতে পারো। রঘু রাওয়ের জন্য রেশমের কাপড় তো কোন ছার, জান দিতেও প্রস্তুত আছি।'

ওখান থেকে ফিরে এসে লোকে এদিক ওদিক খবর নিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে প্রতিটি ঘরেই কাপড় দেখা হতে লাগলো। আর এখন গাঁয়ের লোকেরা যে-কোনো জায়গা থেকে রেশমের জামা আনতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো। অতি বৃদ্ধদের কথাটি সবচেয়ে পছন্দ হলো। যারা ছিল নবীন যুবক, তারা এটাকে নিয়েছিলো ভেরাইয়ার আহাম্মকি হিসেবে। কিন্তু এ সময়ে তারাও সঙ্গে মিশে গেল। ঘরে ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে শলা-পরামর্শ চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে রামালু ধোবী দৌড়ে ভেরাইয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার কাছে ছিল ময়লা কাপড় জড়ানো একখানা পুঁটলী। পুঁটলীটা সে ভেরাইয়ার সামনে খুলে দিয়ে বললো, 'এটাতে দুটো রেশমের জামা আছে—একটা জগন্নাথ রেড্ডীর, আর অন্যটি প্রতাপ রেড্ডীর।'

ভেরাইয়া ঘৃণাভরে বললো, 'আমার ছেলে জমিদারের জামা পরবে ? রামালু তুমি কেমনধারা কথা বলছো !' রামালু হতবুদ্ধি হয়ে বললো, তবে আর এ গাঁয়ে রেশমের জামা কোথা থেকে আসবে ?

ভেরাইয়া চুপ করে রইলো। অনেক যুবক ফিরে গেল। আচমকা কি একটা মনে পড়তেই সে নিজের ঘরের দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে চলে গেল।

কুঁড়ের মধ্যে রাখা কাঠের সিন্দুকটা খুলে সে নিজের ছেঁড়া কাপড়গুলো বাইরে বের করলো। একদম তলায় তার স্ত্রীর কাপড়চোপড় রাখা ছিল। এগুলি তার শ্বশুর মেয়েকে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। আর সব কাপড়ই ছিঁড়ে গেছে, রয়েছে শুধু রেশমের ওড়নাটাই। এখানি রঘু রাওয়ের মা তার পুত্রবধূর জন্যে রেখে দিয়েছিল। রাওয়ের মা মাঝে মাঝে বড় বড়াই করে তার স্বামীকে ওড়নাখানি দেখিয়ে বলতো, কোনো বেগারীর বউয়ের এমন একখানি ওড়না আছে নাকি ? আমার ছেলের বিয়েতে এখানি বউমাকে দেব। ভেরাইয়া সযত্নে সিন্দুকের সবচেয়ে নিচেরতলা থেকে হাতে-তোলা চুমকিভরা ওডনাখানি বের করলো। লাল রঙের চমৎকার ওড়না। সাবেকি রেশম বলে ভালো ছিল। প্রদীপের আলোয় ওড়নাখানি সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। অনেক ছোকরা ভয়ানক খুশি হয়ে এমনিধারা চিৎকার করে উঠলো যে মনে হোল তারা একটা লড়াই জিতে নিয়েছে। 'মিলে গেছে জামা।'

ভেরাইয়া জিজ্ঞাসা করলো, 'এই ওড়নায় জামা হবে ?' একজন কিষান বললে, 'হবে না কেন ? সোমাপ্পা দরজিকে এখনই ডেকে আনো। সময় খুব কম।' জনৈক কিষাণ দরজিকে ডাকতে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই সে সোমাপ্পাকে সাথে নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এলো। সোমাপ্পা কাপড় দেখে বললো, 'সার্ট তো এতে হবে না। ফতুয়া হতে পারে।' যুবকরা চিৎকার করে বললো, 'তবে ফতুয়াই বানাও, জলদি।'

সোমাপ্পা বললো, 'আমি মেশিনটাকে ভুলে ঘরে রেখে এসেছি।' সঙ্গে সঙ্গে একজন কিষাণ সোমাপ্পার বাড়ি গেল মেশিন আনতে। ইত্যবসরে সোমাপ্পা কাপড়ের ভাঁজ খুলে দেখতে লাগলো। দেখলো কাপড়খানির দু'তিন জায়গায় পোকায় কেটেছে: ভেরাইয়া ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'এখন কি হবে ?' সোমাপ্পা মুচকি হেসে বললো, ভাবনার 'কিছু নেই। এমনভাবে কাটবো যে পোকায় কাটা জায়গাগুলি বাদ পড়ে যাবে। রঘু রাওয়ের জামায় কোনো ছিদ্র থাকবে না।'

এরই মধ্যে মেশিন এসে গেল। সোমাপ্পা অতি যত্নে ওড়নাটি কাঁচি দিয়ে কেটে মেশিনে সুতো পরিয়ে চালাতে লাগলো। প্রায় অর্ধেক গাঁ সোমাপ্পার মেশিন চালানো দেখতে লাগলো। এরকম আজব ও অপূর্ব জামা তারা

আজ পর্যন্ত কখনো দেখেনি। তাদের এমনধারা মনে হতে লাগলো যে রেশমের প্রতিটি সুতোর সাথে গ্রামবাসীদের শ্বাসপ্রশ্বাসগুলিও যেন সেলাই হয়ে যাচ্ছে। এদের সব আশা ও প্রার্থনা এই রেশমের চুমকির বাইরে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করছিলো। একবার মেশিন চালাতে চালাতে সোমাপ্পার হাতে সামান্য রেশম ছিঁড়ে গেল। অমনি শত শত অন্তঃকরণ থেকে এমন জোরে 'আঃ'। শব্দ উঠলো যেন ওই রেশমটির সাথে তাদের প্রাণগুলিও ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সোমাপ্পা এরপর অত্যন্ত সাবধানে মেশিন চালাতে লাগলো। একটি স্ত্রীলোক বললো, 'সোমাপ্পা জলদি করো। তোমার জামা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমি এর ওপর ফুল কাটবো।' যুবকরা অবাক হয়ে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকালো। 'স্ত্রীসভা এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে।' স্ত্রীলোকটি বললো।

এর পরে জামাটি আব ভেরাইয়ার ছেলের রইলো না, সারা গাঁয়ের ছেলেদের হয়ে গেল। পাঁচজন মহিলা গান গাইতে গাইতে জামাটির উপর ফুলপাতা কাটলো। বুকে আঁকলো কাস্তে হাতুড়ি আর গমের শীষের চিহ্ন। স্ত্রীলোকেরা জামায় তিলক লাগালো। কিছু কিছু স্ত্রীলোক ইতিমধ্যে ফুলেব হার তৈরি করে নিয়েছে জামাটি এই ফুলের হারের মধ্যে। এরইমধ্যে কারো খেয়াল হোল, সবই তো হোল কিন্তু ইস্ত্রী করাটা যে বাকি রয়ে গেল! লোহার ইস্ত্রী আবার সোমাপ্পার কাছেও নেই। ছিল শুধু জমিদারের দরজির কাছে। গড়ের পিছনে তার ঘর। সেখানে যাবে কে? কেননা, পুলিশ পাহারা রয়েছে কাছেই। আর এইসময় এরা যদি কোনো সাড়া পায়। হয়তো বা তারা সাড়া পেয়েই গেছে। হয়তো বা এরা কোনো হামলার প্রত্যাশা করছে।

দুজন কিষাণ বললো যে তারা গড়ের পিছনে গিয়ে জমিদারের দরজিব কাছ থেকে ইস্ত্রিটা চেয়ে আনবে।

সেই দু'জন কিষান চলে যাবার পর রঙড়ু বেগারী বললো, 'জঙ্গলে খবর দাও। গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দাও। আমরা সবাই রেশমের জামাটি নিয়ে জেলখানায় যাবো।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপে সমগ্র গ্রামখানিই এসে জড়ো হোল। মশাল জ্বলছে, ধ্বনি উঠছে। এমন আর কারো জমিদার বা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ভয় নেই। সেই দুজন লোক যখন লোহার ইস্ত্রী নিয়ে এলো তখন তাদের একজনের হাঁটু জখম হয়ে গিয়েছিলো। এইসময়ে গাঁয়ের লোকের খুশির

মাত্রা বহু উপরে উঠে গেল। খুশি ভরা আওয়াজ গাঁয়ে ধ্বনিত হতে থাকলো। বোধহয় এই আওয়াজ অন্যান্য গাঁয়েও পৌঁছে গেছে। সেসব গাঁ থেকেও জবাব প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করলো।

ইস্ত্রী করার পর জামাটাকে হারে সাজানো হোল, ইত্যবসরে পাত্তিপাড়্ গাঁয়ে বুররাকথা-গায়ক, ঢুলি ও অন্যান্য কিষাণরা একের পর এক এসে পৌঁছতে লাগলো। ক্ষণে ক্ষণে তাদের উৎসাহও লাগলো বাড়তে।

সে রাতটি কেউ ভুলবে না। সে রাতে মশাল জ্বালিয়ে পাঁচ হাজার কিষাণের জমায়েত যখন জমিদারের গড়ের কাছে পৌঁছলো তখন জমিদার সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে সদলবলে। পথে যেখানে যেখানে গ্রাম পড়লো, সে-সব গাঁয়ের লোকও এই আজব ও অপূর্ব জনসমাবেশে সামিল হতে চললো। অন্যদিকে জমিদাররা প্রত্যেক গাঁ থেকে শহরের দিকে চলা শুরু করলো। জনতার আওয়াজ উঁচু হয়ে উঠলো, শোভাযাত্রাটি জয়যাত্রার মিছিলের মতো জেলের দিকে জোর কদমে এগুতে থাকলো। জেলখানা তখন একরাত্রির পথ।

ভোরের খুব কাছাকাছি……

অতি প্রত্যুষে রাও জামাটি পেয়ে বাবার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো। বিস্ময়, মমতা, উল্লাস ও উদ্দীপনায় ওর বুক উঠলো ফুলে। কিরকম কষ্ট করে এই জামাটি তৈরি করা হয়েছে, আর কেমন করে দশহাজার কিষাণ এই জামাটি নিয়ে জেলখানার দরজায় এসেছে সে-কথা ওর বাবার কাছে শুনে রঘু রাওয়ের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ও শিশুর মতো বাবার কাঁধের উপর রাখলো মাথা। বাবা ছেলেকে বুকে সজোরে চেপে ধরলো।

ভেরাইয়া বললো, ‘সময় আর নেই। আমার ইচ্ছে তুমি এই জামাটি পরে নাও। গ্রামবাসীদেরও ইচ্ছে তাই। তুমি চাও তো এর উপর জেলখানার কাপড়টা চাপাতে পারো।’

রঘু রাও মুচকি হেসে জেলখানার কাপড়টি খুলে ফেললো আস্তে আস্তে, অত্যন্ত যত্নের সাথে রেশমের ফতুয়াটি পরতে লাগলো। ওর বাবা সস্নেহে তার সন্তানের জামা পরা দেখছিল। ছেলের মনেও নানারকমের ভাবনা। লাল রেশমের জামাটা পরে মনে হোল ও শুধুমাত্র একটা জামাই পরে নি—নিজের ঝাণ্ডা এবং ওর যুদ্ধ ও জেহাদের একটা অপূর্ব নিশানও পরেছে। এ যেন নিজেরই গায়ের রক্ত, নিজের জমি-জমা, তার বাবার স্নেহ ও মায়ের আদর। রঘু রাওয়ের বুক গর্বে ফুলে উঠলো। রেশমের লালচে ও নরম

মসৃণতাকে ছুঁয়ে অনুভব করলো যে সে যেন মাকড়সার জালের মতো মানুষের মনের হাজার হাজার কামনা ও বাসনাকে দিয়েছে ছুঁয়ে। লাল রেশমের জামার উপর হাত বোলাতে বোলাতে অত্যন্ত মনোযোগ ও প্রীতির সাথে বাবার দিকে তাকিয়ে রাওয়ের মনে হোল যে প্রত্যূষের উজ্জ্বলা রাতের গালে এমন আঘাত হেনেছে যেন জেলের সমস্ত লোহা গলে বয়ে চলেছে, বাকি শুধু কয়েকটিমাত্র লোহার গরাদ। পরের মুহূর্তেই ও দেখলো প্রাচীরের ওপারে আকাশের বুকে উদীয়মান সূর্যকে। যেন মায়ের আঁচল থেকে শিশুটি লাফিয়ে বেরিয়ে এলো। ও চিৎকার করে বললো, 'দেখ, দেখ বাবা, জেলে লোহার গরাদও সূর্যকে আটকে রাখতে পারে না।'

ভেরাইয়ার চোখে জল। এই পবিত্র অশ্রুকণা সে মুছলো না, বরং নিজের জীর্ণ শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যেতে দিলো। ওয়ার্ডার পরিবেষ্টিত হয়ে তার ছেলে মধু রাও নিজের মাথার উপর সকালের শিশির ও মনের সূর্য নিয়ে ফাঁসী কাঠের দিকে এগুতে লাগলো। আর, শোভাযাত্রার আওয়াজ জেলের প্রাচীর টুকরো টুকরো করে দিয়ে শূন্যে ধ্বনিত হয়ে চললো।

দেখ সারা তেলেঙ্গানা উঠেছে জেগে
তবলা বাজাও,
হও জয়যাত্রার পথপ্রদর্শক
যুদ্ধকে করো জয়
এসো সব অন্ধ্রের তনয়।

জেলের বাইরে যে গানের গুঞ্জন চলছিলো, জেলের ভিতরেও ভেরাইয়ার ঠোঁটে সে গান ফুটে বেরুলো, গান গাইতে গাইতে ভেরাইয়ার মনে হোল যেন ওর ভিতর একটা পতাকা ফুটে উঠেছে, যার উপর সোনালী গমের শীষের মতো শহীদদের চেহারা প্রদীপ্ত। গান গাইতে গাইতে ভেরাইয়ার মনে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, যে-পর্যন্ত অন্ধ্রের কিষাণ জীবিত থাকবে, তাদের অন্তঃকরণে পতাকা ও গান বেঁচে থাকবে, ততদিন ওর ছেলেও বরাবর থাকবে বেঁচে। আর তাদের গাঁয়ে দেশমুখদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে না কখনো, কোনদিন।